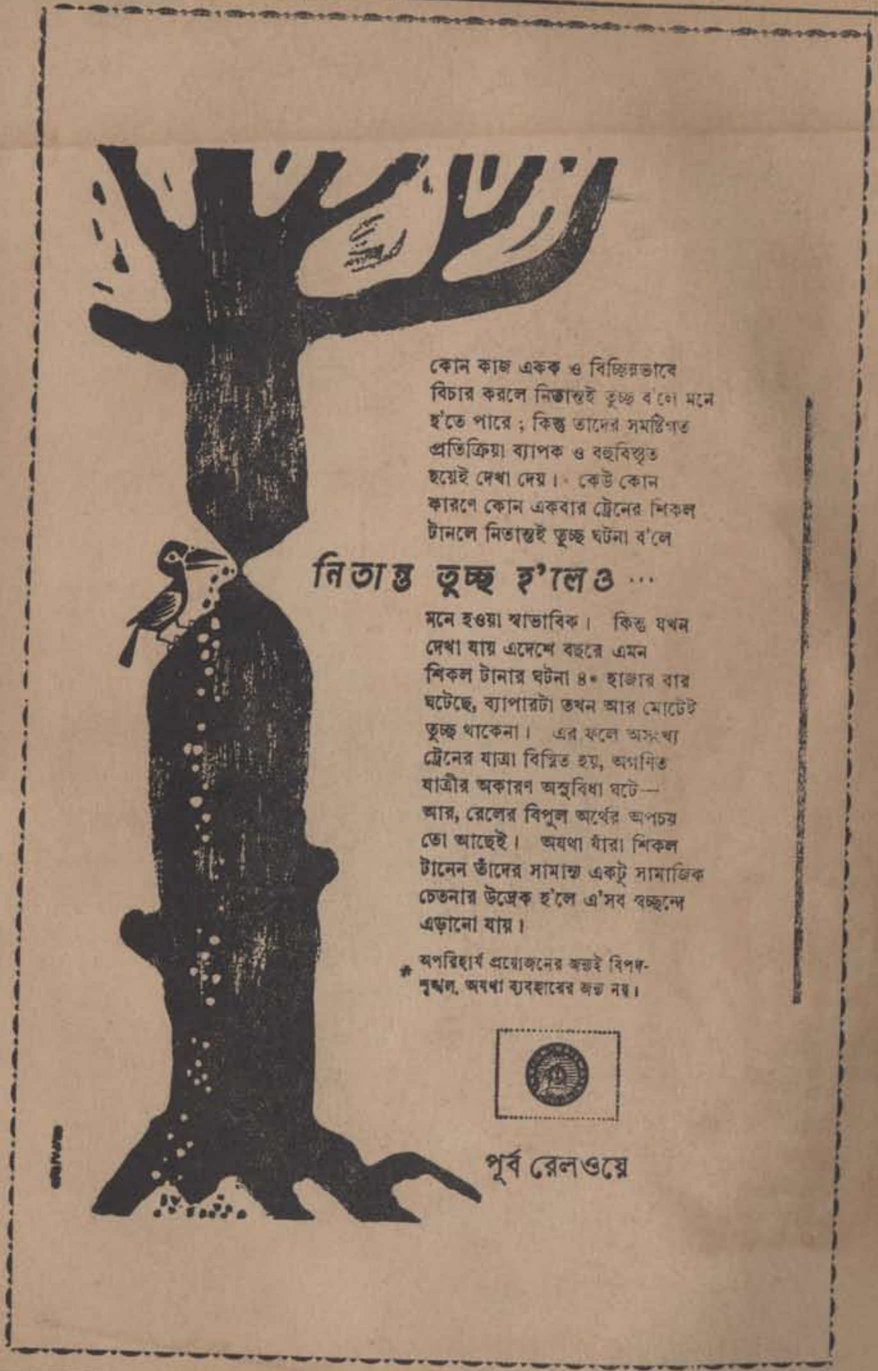
PARICHAYA :: MAY 1962 :: Regd. No. C 3953



দাম: এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা



জ্যৈষ্ঠ • ১৩৬৯

সূ চী প ত্র

জ্যৈষ্ঠ

প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায়

চিত্র : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত ।



ওরা কাজ করে — দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

পরিচয়
বর্ষ ৩১ । সংখ্যা ১১
জ্যৈষ্ঠ । ১৩৬৯

বিশশতকের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি

রণজিৎ দাশগুপ্ত

"There are times which are not ordinary, and in such times it is not enough to follow the road. It is necessary to know where it leads, and, if it leads nowhere, to follow another." R. H. Tawney.

১৮৪৫ সালে এঙ্গেলস-এর 'Conditions of the Working Class in 1844' বইটি প্রকাশিত হয়। ৪৭ বছর পরে ১৮৯২ সালে বইটির ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায় পূর্বেকার আলোচনা ও মতামতের যথার্থতা প্রসঙ্গে এঙ্গেলস লিখেছিলেন : "The wonder is, not that a good many of them proved wrong, but that so many of them proved right." বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এই মন্তব্য শুধুমাত্র ঐ বইটি সম্পর্কেই নয়, মার্কস-এঙ্গেলস-এর সমগ্র চিন্তাধারা সম্পর্কে কী আশ্চর্যজনকভাবেই না প্রযোজ্য !

সমাজতন্ত্রের জীবনযাত্রা

'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৪৮ সালে। ঐ ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রে মার্কস-এঙ্গেলস তৎকালীন সমাজবাস্তবতার বিশ্লেষণ করে ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্রমবর্ধমান অন্তবিরোধ, শ্রমিক-মালিকের দ্বন্দ্ব, শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমপ্রসার, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবক্ষয় ও অবসান, সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজের নিশ্চিত অভ্যুদয় সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। তারপর এক-শ বৎসরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত। এই এক-শ বৎসরের

ইতিহাসে, অভূতপূর্ব পরিবর্তন ও বিস্ময়াবহ ঘটনাবলীর ইতিহাসে, মার্কস-এঙ্গেলস-এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে নিঃসংশয়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই ইওরোপের দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলন ও বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। ইতিহাসে প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটল বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। শতাব্দীর প্রথমার্ধেই জগতের এক-তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলো শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে মার্কসবাদী নীতির ভিত্তিতে। আরও এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যেপে ত্বরিত অবসান ঘটেছে ও ঘটছে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের। এই শতাব্দীরই ষষ্ঠ দশকে শুরু হয়েছে যুদ্ধের বিভীষিকার চির অবসান, সোভিয়েত দেশে সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণ আর মহাকাশ জয়ের উদ্দীপনাময় অভিযান। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা মানব-ইতিহাসের কেন্দ্রীয় নির্ধারক উপাদান। সমাজের গতি-প্রকৃতি ও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনাসমূহ মার্কসবাদের আলোকে উদ্‌ভাসিত, অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্ট, অনেক বেশি স্বচ্ছ।

মার্কসবাদ বাতিল

তবু প্রশ্ন উঠেছে, মুমূর্ষু পচনশীল ধনতন্ত্রের অন্ধ স্তাবকেরা, বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা, 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'-এর পুরোহিতেরা প্রশ্ন তুলেছেন। বুড়ো মার্কস সেই কোন কালে কত বৎসর আগে কি লিখে গিয়েছেন তার কি উপযোগিতা রয়েছে আজকের দিনে, এই বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে? বিলেতের দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের অন্যতম প্রধান তত্ত্ববিশারদ ক্রসল্যাণ্ড সাহেব তো একেবারে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে জানিয়েছেন[১], "His prophecies have been almost without exception falsified, and his conceptional tools are now quite inappropriate." কারণ মার্কস-এঙ্গেলস যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা লিখেছিলেন তার তো কবেই ক্রম পরিবর্তন হতে হতে একেবারে মৌলিক রূপান্তর ঘটে গেছে। সে ধনতন্ত্র আর নেই!

কথাটা অবশ্য নতুন নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আর এই শতাব্দীর গোড়াতে আক্ষরিক অর্থেই শত শত বই লেখা হয়েছে মার্কসবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে, বিশেষত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতিটি সাময়িক সমৃদ্ধিকালে রাশি

রাশি বই প্রকাশিত হয়েছে ধনতন্ত্রের প্রগতিশীলতা বোঝানোর জন্য, আর তাতে কতবার যে মার্কসবাদকে চূড়ান্তভাবে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে তারও কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাতে সমাজতন্ত্রের সংক্রামক অগ্রগতি রুদ্ধ হয় নি, মার্কসবাদের বিশ্ববিজয়ী অভিযান প্রতিহত হয় নি; বরং সে সব সমালোচনাগ্রন্থই আজ কীটের উপজীব্য।

তবু যে কালে দুনিয়ার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের আধিপত্যই ছিল একচ্ছত্র এবং ধনতন্ত্রের প্রসারের সুযোগ ছিল প্রচুর, সেকালে ধনতন্ত্রের মহিমাকীর্তনের আর মার্কসবাদের ভ্রান্তি অন্বেষণের অর্থ বোধগম্য। কিন্তু একালে যখন ধনতন্ত্র ক্রমে বেশি বেশি ক্ষয় পাচ্ছে, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমে বেশি বেশি শক্তিলাভ করছে তখন বুর্জোয়া ও দক্ষিণপন্থী সমাজন্ত্রী তত্ত্ববাগীশদের ধনতন্ত্রকে নবজীবনদানের প্রয়াস নিতান্তই কৌতুকাবহ ও করুণ। তবে এঁদের বক্তব্য যতই অসার হোক না কেন, তার আলোচনা প্রয়োজন। কারণ নানা তর্কের জালে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের একাংশ বিভ্রান্ত হচ্ছেন। ধাঁধা লাগানোর জন্য প্রচার ও চেষ্টার তো কোনো অভাব নেই!

নব্য ধনতন্ত্র

নব্য ধনতন্ত্রের প্রচারবিদদের মতে ধনতন্ত্রের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক দেহে গত কয়েক দশকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। সে পরিবর্তন এতই মূলগত যে তা বিপ্লবের সামিল। একজন তো বই লিখে ফেলেছেন। 'বিংশ শতাব্দীর ধনতান্ত্রিক বিপ্লব'।[২] এই বিপ্লবোত্তর সমাজের হরেক নাম—'প্রাচুর্যের সমাজ',[৩] 'লোকায়ত্ত ধনতন্ত্র', 'ধনতন্ত্র-পরবর্তী সমাজ',[৪] 'কল্যাণ রাষ্ট্র'[৫] ইত্যাদি—শোনা যাচ্ছে। এই সমাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এঁদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও মোটের উপরে এঁরা এক মত। সংক্ষেপে এঁদের বক্তব্য নিম্নরূপ। এ সমাজে দারিদ্র্য ও দুর্দশা দূরীভূত। জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-আরাম প্রচুর। এখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত। অতীত-ধনতন্ত্রের মতো এখানে ক্ষমতার অধিকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মালিক বা ধনিকশ্রেণী নয়। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন-ক্ষমতা এখন বেতনভুক ম্যানেজার ও টেক্‌নোলজিস্টদের।[৬] এদের লক্ষ্য মুনাফা নয়, জনসেবা। ব্যাপকতর

সমাজজীবনে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ফলে ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা খর্বিত। শ্রেণীনিরপেক্ষ আমলারা এই রাষ্ট্রের নিয়ামক শক্তি। এখানেও লক্ষ্য জন- কল্যাণ। সেই উদ্দেশ্যেই এ ব্যবস্থা পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত। ফলে সমাজের সম্পদ ও সম্পত্তির মালিকানার গণতন্ত্রীকরণ তাৎপর্যপূর্ণ আর বণ্টন ক্রমশ বেশি বেশি প্রগতিশীল। উৎপাদনের নৈরাজ্য ও অস্থিরতা এড়ানোর গূঢ় তত্ত্বটি এই সমাজের করায়ত্ত। এই সমাজ সংজ্ঞামুক্ত, সংঘর্ষমুক্ত। শ্রেণীবিরোধ অতীত ইতিহাসের বিষয়। এহেন পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ 'ডগমা' মাত্র. শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে উৎপাদনের উপাদানসমূহকে জন- সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করার সমাজতান্ত্রিক আদর্শটি অচল, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস আমাদেরই পরিবর্তন-বিমুখ, রক্ষণশীল মনোবৃত্তির প্রকাশ।

ক্লাসিকাল মডেলের অবসান

একথা অবশ্য ঠিক, গত সত্তর-আশি বৎসরে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রভূত বদল, অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর পরিবর্তন ঘটেছে। এ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো প্রমুখ ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ধনতন্ত্র সম্পর্কে ধারণাটি আধুনিক ধনতান্ত্রিক বাস্তবতাকে আর প্রতিফলিত করে না। ক্লাসিকাল মডেল অনুসারে ধনতন্ত্র মূলত প্রতিযোগিতামূলক, স্বয়ংচালিত ও স্বয়ংসামঞ্জস্য- সাধক। অসংখ্য ছোট ছোট শিল্প ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা, সামগ্রিক উৎপাদনে প্রতিটি উৎপাদক ও বিক্রেতার নগণ্য অংশ, পণ্যের দাম নির্ধারণে কোনো একটি বা এমনকি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের যুক্তভাবে কার্যকরী প্রভাব বিস্তারে অক্ষমতা—এই ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। উৎপন্ন দ্রব্য এবং কাঁচামাল ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের দাম নির্ধারিত হতো বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতার দর- কষাকষির মাধ্যমে। আর এই বাজারে নির্ধারিত দামগুলিকে হিসেবের মধ্যে এনে প্রতিটি উৎপাদক বা প্রতিষ্ঠান স্থির করত কোন দ্রব্য উৎপন্ন হবে ও কতটা উৎপন্ন হবে, কেমন করে উৎপাদন হবে, কতজন শ্রমিক নিয়োগ করা হবে, কি পরিমাণ মূলধন কোথায় বিনিয়োগ করা হবে ইত্যাদি। অবশ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একক সিদ্ধান্তসমূহের একটা সামগ্রিক প্রভাব ছিল, সেই প্রভাবের ফলেই দেখা দিত বিভিন্ন দ্রব্য ও উৎপাদন উপকরণগুলির

দামের পরিবর্তন, আবার বাজারে দামের এই পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াতেই উৎপাদক-প্রতিষ্ঠানগুলির সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আসত। স্পষ্টতই অর্থনৈতিক কার্যকলাপ স্থিরীকৃত হতো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিংবা সমাজের সমষ্টিগত পরিকল্পনা অনুযায়ী নয়। এসব নির্ধারিত হতো এ্যাডাম স্মিথের বিখ্যাত 'invisible hand' বা 'অদৃশ্য হাত'-এর তাড়নায়। অর্থাৎ বাজারে দামের পরিবর্তন এবং প্রতিষ্ঠানগুলির সিদ্ধান্তের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে, 'ল অব ভ্যালু'-র নৈর্ব্যক্তিক কার্যকারিতার দ্বারাই হতো উৎপাদন ও বণ্টন সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার সমাধান, সম্ভবপর হতো অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের একক ও স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে মোটামুটি সামঞ্জস্য- সাধন। এই laissez faire নীতির উদ্গাতারা আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, এই প্রক্রিয়াতেই "The greatest happiness of the greatest number" সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

অবাধ বাণিজ্য, অবাধ প্রতিযোগিতা—এই ধনতন্ত্রের প্রধান কথা। উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করে উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং ফলস্বরূপ উৎপন্ন দ্রব্যের দাম কমানো ছিল প্রতিযোগিতার প্রধান রূপ। নিত্য নতুন উদ্ভাবন ছিল এই প্রতিযোগিতায় অস্তিত্ব বজায় রাখার অপরিহার্য শর্ত। এই নিরন্তর উদ্ভাবনের প্রয়োজনে ঘটতে থাকল মূলধনের সঞ্চয়; আবার, বর্ধিত মূলধনের বিনিয়োগও ঘটল এই উদ্ভাবনের কাজে।

উনবিংশ শতাব্দীর ধনতন্ত্রের এই চিত্রটি কিন্তু আর সমসাময়িক অর্থ- নৈতিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে না। গত শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই ধনতন্ত্রের একচেটিয়া প্রবণতা সুস্পষ্ট। আর বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতেই নানা দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে জেঁকে বসল বিরাট বিরাট দৈত্যাকার একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান, উদ্ভব হলো একচেটিয়া ধনতন্ত্রের; প্রতি- যোগিতার অবসান ঘটল তা নয়; একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এবং একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা বহাল রইল—কিন্তু প্রতিযোগিতার রূপ ও ধরণ গেল পালটে। এক একটি শিল্পে পণ্যের মোট সরবরাহের প্রধান অংশটি হয়ে পড়ল অল্প কয়েকটি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন। বিপুল মূলধন, বিরাট উৎপাদন, বৃহৎ আকার, বিশাল কর্তৃত্ব, দুনিয়াজোড়া কারবার এদের। বাজারের উপর, যোগান ও দামের উপর এদের প্রভাব আর তুচ্ছ নয়, পরিবর্তে রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ।

নিঃসন্দেহেই এই পরিবর্তনের প্রভাব ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পক্ষে হয়েছে ব্যাপক ও গভীর।

প্রকৃতপক্ষে গত শতাব্দীতে ধনতন্ত্রের অবাধ প্রতিযোগিতামূলক প্রকৃতি, মূলধনের ক্রমবর্ধমান সঞ্চয় এবং নিরন্তর উদ্ভাবনের প্রবণতার মধ্যেই নিহিত ছিল একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বীজ। এবং মূলধনের কেন্দ্রীকরণ ও একত্রীকরণের প্রবণতা প্রথম বিশ্লেষণ করেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। পরবর্তী মার্কসবাদীরা—কাউটস্কি, হিলফারডিং, রোজা লাক্সেমবুর্গ এবং প্রধানত লেনিন এই বিশ্লেষণকে আরও বিকশিত করেন।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা কিন্তু ১৯৩০ সালের আগে ধনতন্ত্রের একচেটিয়া প্রবণতার অস্তিত্বটি স্বীকার পর্যন্ত করেন নি। তখন অবধি তাঁরা ক্লাসিকাল মডেলের প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্রের বিশুদ্ধতার ভাবে বিভোর। আশ্চর্যের বিষয়, আজ এঁরাই আবার এই বিশেষ পরিবর্তন এবং তার অন্য কয়েকটি অনুষঙ্গ (যেমন, অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা)-র জের টেনে 'নব্য ধনতন্ত্র', 'ধনতন্ত্রের প্রগতিশীলতা' ইত্যাদির দাবি করছেন। কিন্তু সে দাবিগুলি একেবারেই অসার। এর মানে এ নয় যে, ধনতন্ত্রের সাম্প্রতিক পরিবর্তনসমূহের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে এবং প্রগতিশীল, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও আন্দোলনের নিজস্ব বিকাশ ও অগ্রগতির তাগিদেই এই পরিবর্তনসমূহ যথাযথ বিশ্লেষণ, তাৎপর্যনির্ধারণ ও মূল্যায়ণের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু মনোপলির উদ্ভব, রাষ্ট্রের ভূমিকা ও অন্যান্য নানা পরিবর্তন যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, গত শতাব্দীর ধনতন্ত্র ও আমাদের সমসাময়িক ধনতন্ত্র মূলগতভাবে অভিন্ন, অন্তর্বস্তু অপরিবৃতিত। এবং এ সিদ্ধান্তটিই বর্তমান আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়।

দারিদ্র্য ও দুর্দশার অবসান?

'নব্য ধনতন্ত্র'-র প্রচারবিদদের অনেকে অবশ্য খুবই চতুর। তাঁরা এক কথায় মার্কসবাদকে বাতিল করে দেন নি। তাঁরা বলতে চান, গত শতাব্দীর মধ্যভাগে শিল্প শ্রমিকদের শোচনীয় দারিদ্র্য ও তীব্র শোষণের পটভূমিতে মার্কসের অনেক বিশ্লেষণ হয়তো যথার্থ। কিন্তু বর্তমানে লোকায়ত্ত ধনতন্ত্রের আওতায় দারিদ্র্য ও দুর্দশার অবসান ঘটেছে। জনসাধারণের জীবনমানের আশ্চর্য উন্নতি ঘটেছে। আর কোথাও না হোক, অন্তত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা

ইংল্যাণ্ডের মতো দেশে দারিদ্র্যের আর কোনোই স্থান নেই। গলব্রেথ সাহেব তো লিখেছেন, মার্কিন দেশের 'প্রাচুর্যের সমাজ'-এ লোকে আর না খেয়ে মরে না, বরং বেশি খেয়ে মরে। অতএব, মার্কসবাদ নেহাৎই একটা প্রাণহীন 'ডগমা' ভিন্ন আর কি? কিন্তু সত্যিই কি তাই? বাস্তবের সাক্ষ্য অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত।

সন্দেহ নেই, এক-শ বৎসর আগের ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আজকের ইংল্যাণ্ডের প্রভেদ বিস্তর। এ বিষয়েও সন্দেহ নেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়ার সমৃদ্ধতম দেশ, এখনো সে দেশে অধিকাংশ দ্রব্যের মাথা পিছু উৎপাদন সোভিয়েত রাশিয়া থেকে অনেক বেশি। কিন্তু এ সবের অবশ্যম্ভাবী অর্থ যে সাধারণ মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক দৈন্যের অবসান নয়, তার নমুনা বিস্তর।

নিউ ইয়র্কের কমিউনিটি কাউন্সিল ১৯৫৭ সালের জন্য পারিবারিক বাজেট তৈরি করেছিলেন। সে বাজেট অনুসারে নিউ ইয়র্কে চারজন সভ্যের একটি পরিবারের অতি সাধারণভাবে ভরণপোষণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা ইত্যাদি বাবদে নিম্নতম প্রয়োজন বার্ষিক চার হাজার ডলারেরও বেশি আয়। অন্যান্য নানা সংস্থাসমূহের প্রণীত হিসেবও অনুরূপ। নিঃসন্দেহে চার হাজার ডলার আয়ে আমাদের দেশের সাধারণ জীবনযাত্রার মানের থেকে অনেক ভালো থাকা যায়। কিন্তু এই চার হাজার ডলারই ও দেশের বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতি, জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক বিকাশ অনুসারে, মার্কসের বিশিষ্ট সংজ্ঞার্থে subsistence wage বা জীবন ধারণোপযোগী মজুরী। এই চার হাজার ডলারই হলো ও দেশের দারিদ্র্যের সীমারেখা।[৭]

কিন্তু কতজনের বার্ষিক আয় চার হাজার ডলার? মার্কিন সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, মার্কিন পরিবারসমষ্টির শতকরা ৩৬·৩টির আয় নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয়ের কম; আর শতকরা ২৪·৫টি পরিবারের আয় তিন হাজার ডলারেরও কম। অর্থাৎ বহু বিজ্ঞাপিত 'প্রাচুর্যের সমাজ'-এও মোট পরিবারসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি দারিদ্র্যক্লিষ্ট। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, সুচিকিৎসার অভাব—সংক্ষেপে, সুস্থ ও সুন্দর জীবনের অভাব হলো এক-তৃতীয়াংশ পরিবারের ভাগ্য।

'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর মতো পত্রিকার বিবরণী থেকে জানা যায়[৮], ১৯৫৯ সালে ৭০ লক্ষেরও বেশি লোক অর্থাৎ ও দেশের জনসমষ্টির শতকরা ৪

ভাগই কোনো না কোনো ধরণের খয়রাতি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। অন্তত ২ কোটি শ্রমিক নিম্নতম মজুরী আইনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এসবের অর্থ কিন্তু খুবই সহজ-সরল : প্রাচুর্য নয়, বরং দুঃস্থতা ও দুর্দশা আজও মার্কিন দেশে বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের জীবনের নিদারুণ বাস্তবতা।

কিন্তু এখানেই দুর্গতির শেষ নয়। গলব্রেথ সাহেব নিজেই জানিয়েছেন[৯], মার্কিন দেশে জণকল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি অবহেলিত। জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা-সমূহ উপেক্ষিত। স্কুলগুলি পুরনো ও ভীড়াক্রান্ত। রাস্তা আর ফাঁকা জায়গাগুলি নোংরা। পরিবহন ব্যবস্থা অস্বাস্থ্যকর ও ময়লা। বাসস্থান ঘিঞ্জি। বস্তি-অঞ্চল এখনো বর্তমান।

ধনতান্ত্রিক সমৃদ্ধির পীঠস্থান মার্কিন দেশেই যদি অবস্থা এই ধরণের হয়, তবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাভুক্ত অন্যান্য দেশের পরিস্থিতি সহজেই অনুমেয়। আর দারিদ্র্য ও দুঃস্থতার অবসানে ধনতন্ত্রের 'কৃতিত্ব' বিচারে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইংল্যাণ্ডের মতো দেশের অবস্থা আলোচনাই যথেষ্ট নয়। কেননা ধনতান্ত্রিক বন্দোবস্তের চৌহদ্দি তো শুধুমাত্র ঐ দুটি কিংবা ঐ রকমের আর দু-একটি দেশে সীমাবদ্ধ নয়। ধনতন্ত্র মূলত একটি আন্তর্জাতিক বন্দোবস্ত। মার্কস-এঙ্গেলস সেই পটভূমিতেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলাফল আলোচনা করেছেন। সুতরাং, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির রেকর্ড বিচারে, পৃথিবীর অন্যত্র যেসব দেশে ধনতন্ত্রের প্রবেশ ঘটল, সেসব দেশে ধনতন্ত্র কি ফল প্রসব করল তারও হিসেব-নিকেশ নিতে হবে। আর একথা কার না জানা আছে যে, এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকায় তো বটেই, এমন কি ইওরোপেরও কোনো কোনো (যেমন, স্পেন, পর্তুগাল, গ্রীস ইত্যাদি) দেশে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনে ধনতন্ত্রের পরিণাম একান্তই মর্মান্তিক। দুঃসহ দারিদ্র্য, অনশন-অর্ধাশন, ব্যাপক অশিক্ষা, ভয়াবহ শিশুমৃত্যু, রোগের বিভীষিকা এসব দেশের জনসাধারণের নিত্যসঙ্গী। আর এসবই তো বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশেষত্ব।

নব্য ধনতন্ত্রের দাবিদারেরা যে এসব বিষয়ে অনবহিত তা মোটেই নয়। তাঁরা এ সম্পর্কেও অবহিত যে ইংল্যাণ্ড বা মার্কিন দেশের শ্রমিকদের যে অতীতের তুলনায় এবং অধিকাংশ ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় বেশি মজুরী দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে তার কারণ হলো : [১] জীবনমানের উন্নয়ন ও মজুরী বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকশ্রেণীর দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র সংগ্রাম, [২] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও

তার পরবর্তীকালের বিশেষ পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধি এবং ধনিকশ্রেণীর দুর্বলতাবৃদ্ধি, [৩] উপনিবেশগুলির প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন এবং সেগুলির সঙ্গে অসম বাণিজ্য। তদুপরি রয়েছে কোনো কোনো দেশের বিশেষ আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, যেমন মার্কিন দেশে [ক] প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য, [খ] দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভৌগোলিক সীমা প্রসারের সুযোগ, [গ] জন-স্বল্পতা, এবং [ঘ] কোনোরকম সামন্ততান্ত্রিক পটভূমি ও অবশেষের অনুপস্থিতি। বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা এসব বিশেষ কারণ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তথাপি এঁরা প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডের বিশেষ কতকগুলি দিককে আলাদা করে তুলে ধরে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কৃতিত্ব জাহির করতেই ব্যস্ত। ফলে বিশ্ব-ধনতান্ত্রিকব্যবস্থার দুঃস্থতা ও দুর্দশার চিত্রটি এঁদের কাছে একেবারেই উপেক্ষিত।

সম্পত্তির মালিকানা-সম্পর্ক

ধনতন্ত্রের আওতাভুক্ত দেশগুলিতে জনসাধারণের শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থা এবং জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহের চরম অবহেলা আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। এর মূল কারণ সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। যে সমাজে সম্পদ ও আয়ের উৎপাদন ও বণ্টনে তীব্র বৈষম্য বর্তমান এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কর্তৃক কেন্দ্রীভূত সে সমাজের অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ দারিদ্র্য আর দুর্দশা, একচেটিয়া মালিকদের ব্যক্তিগত মুনাফার স্বার্থে জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি ও জনস্বার্থের সম্পূর্ণ অবহেলা।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের অন্যতম প্রবক্তা ক্রসল্যাণ্ড সাহেব অবশ্য 'ধনতন্ত্র-উত্তর সমাজ'-এর কথা প্রচার করছেন। কিন্তু এই 'ধনতন্ত্র-উত্তর সমাজ'-এও উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা, সম্পত্তির মালিকানা ধনিকের। ইস্পাত এবং এ্যালুমিনিয়াম কারখানা, কয়লা ও তেলের খনি, জমি আর ব্যাঙ্ক—এসবেরই মালিকানা-পরিচালনার অধিকার মুষ্টিমেয়র কুক্ষিগত ; পক্ষান্তরে, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি শ্রমজীবী জনসাধারণ উৎপাদনের উপায়ের, জাতীয় সম্পত্তির মালিকানা ও কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

কিন্তু যেহেতু সমাজে আয়ের পন্থা মাত্র দুটি—সম্পত্তির মালিকানা অথবা শ্রম, সেহেতু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনিকের আয় সম্পত্তির মালিকানাজাত

(শ্রমে তারা অংশ নিতে পারে—কিন্তু সেটা গৌণ), অন্যদিকে জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের আয় হলো রক্তজলকরা শ্রমের ফল। বস্তুতপক্ষে যে সমাজে সম্পত্তির মালিকানা ও কর্তৃত্ব মুষ্টিমেয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন, সে সমাজে সম্পত্তিহীন জনসাধারণের বেশির ভাগই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সম্পত্তি ও মূলধনের মালিকের কাছে শ্রমশক্তি বিক্রয়ে, মজুরীর বিনিময়ে শ্রমশক্তি বিক্রয়ে, বাধ্য। শ্রমিকের সামনে এই মজুরী-দাসত্ব ভিন্ন আয়ের অন্য কোনো পথ খোলা নেই। শ্রমিক মজুরীর বিনিময়ে তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করে, মালিকের জন্য শ্রম করে, উৎপাদন করে। কিন্তু সে যে পণ্য উৎপাদন করে তার মূল্য প্রাপ্ত-মজুরীর থেকে অনেক বেশি। কিন্তু নিজের শ্রমের ফলে শ্রমিকের কোনো অধিকারই নেই, মূলধনের মালিকই উৎপন্ন পণ্যের মালিক। সুতরাং শ্রমিক প্রদত্ত-মজুরীর অতিরিক্ত যে মূল্য উৎপাদন করছে তার মালিকও ধনিক। সম্পত্তির মালিকানার জোরে মজুরীহীন শ্রম বা উদ্বৃত্ত মূল্যের অধিকারী হলো ধনিকশ্রেণী। আর এই অনুপার্জিত আয় আত্মসাৎ করেই মালিকের ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, মর্যাদা। পরিণামে সমাজ দ্বিধাবিভক্ত। শ্রমিক-মালিকের সংঘর্ষে সংক্ষুব্ধ ও খণ্ডিত। মার্কস ও এঙ্গেলস ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির এই স্বরূপটিকেই বিশ্লেষণ করেছিলেন তাঁদের রচনাবলীতে।

অবশ্য ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক ও ধনিক ভিন্ন আর কোনো শ্রেণী নেই এমন নয়। কৃষক, কারিগর, ছোট ব্যবসায়ী, অফিস কর্মচারী, শিক্ষক, ডাক্তার ইত্যাদি মধ্যবর্তী নানা শ্রেণী ও অংশ রয়েছে। কিন্তু এসব মধ্যবর্তী শ্রেণী ও অংশের অস্তিত্ব সত্ত্বেও শ্রমিক ও ধনিকের বিভাগ ও বিরোধটাই ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রধান কথা।

'ধনতন্ত্র-উত্তর সমাজ'

বিংশ শতাব্দীর ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেও মার্কস-এঙ্গেলস বিবৃত এই মূল চিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। আজও সম্পত্তি ও মূলধনে মালিকানার অধিকার অসম। এবং ফলস্বরূপ আয়ের বণ্টনও বিষম। নমুনা হিসেবে বলা যায়, ইংল্যাণ্ডে দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে দেশের মোট মূলধনের অধেক অর্থাৎ শতকরা ৫৯ ভাগেরও বেশির মালিক ছিল জনসমষ্টির শতকরা ১ ভাগ, আর শতকরা ৮০ ভাগ মূলধন কেন্দ্রীভূত ছিল জনাধারণের শতকরা ৫ কি

৬ ভাগের হাতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালেও সম্পত্তি বণ্টনের এই প্যাটার্নে উল্লেখযোগ্য কিছু হেরফের হয় নি। ১৯৪৬-৪৭ সালে মোট মূলধনের অর্ধেকই জনসাধারণের শতকরা ১ ভাগের সামান্য কিছু বেশির হাতে পুঞ্জীভূত ছিল আর মূলধনের শতকরা ৮০ ভাগ ছিল মাত্র শতকরা ১০ জনের হাতে। অপর দিকে জনসমষ্টির দুই-তৃতীয়াংশ মালিক ছিল মাত্র শতকরা ৫ ভাগ মূলধনের।[১০]

'জনগণের ধনতন্ত্র'-র সেলসম্যানেরা জোর গলায় দাবি করছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূলধনের মালিকানার গণতন্ত্রীকরণ ঘটছে, শেয়ার মালিকানার বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে। এই দাবির সমর্থনে বলা যেতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৭ সালে শেয়ার-মালিকের সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ থেকে ৬০ লক্ষ, ১৯৫৬ সালে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে হয় ৮৬ লক্ষেরও বেশি। শেয়ার-মালিকদের এই সংখ্যা বৃদ্ধি কি বৈষম্য হ্রাসের প্রমাণ নয়? না, তা নয়। কেননা উল্লিখিত তথ্যটুকুই সব নয়। এ বিষয়ে দেখা প্রয়োজন, প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসমষ্টিতে শেয়ার-মালিকদের অনুপাত কত? দ্বিতীয়ত, কোন ধরণের লোক শেয়ারের মালিক? তৃতীয়ত, মালিকানাধীন শেয়ার থেকে কোন ধরণের লোকের কত আয় হয়?

এক : ১৯২৭ থেকে ১৯৫৬, এই ৩০ বৎসরে শেয়ার মালিকদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু জনসমষ্টিতে শেয়ার-মালিকদের অনুপাতে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে নি। নিচের তালিকাটি[১১] থেকেই এ সিদ্ধান্তের প্রমাণ পাওয়া যায় :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসমষ্টিতে শেয়ার-মালিকদের অনুপাত

সাল	শেয়ার-মালিকদের সংখ্যা [লক্ষ]	জনসংখ্যা [লক্ষ]	শেয়ার-মালিকদের অনুপাত
১৯২৭	৪০—৬০	১১৯০	৩·৪—৫·০
১৯৩০	৯০—১১০	১২৩০	৭·৩—৮·৯
১৯৩৯	৮০—৯০	১২৯০	৬·২—৭·০
১৯৫২	৬৪·৯	১৫৭০	৪·১
১৯৫৪	৭৫	১৬২০	৪·৬
১৯৫৬	৮৬·৩	১৬৮০	৫·১

দুই : সরকারী বিবরণ অনুসারে,[১২] ১৯৫৫ সালে ৫ লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারী-পরিবার শেয়ারের মালিক। কিন্তু কত শেয়ারের তারা মালিক?

হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে, শ্রমিক-কর্মচারীদের শেয়ারের মূল্য দেশের সমস্ত শেয়ারের মোট মূল্যের মাত্র শতকরা এক ভাগেরও দুই-দশমাংশ। পক্ষান্তরে, রকফেলার মর্গান ইত্যাদির মতো যে কোনো একটি ধনকুবেরগোষ্ঠীর মালিকানাধীন শেয়ারের মূল্য দেশের সকল শ্রমিক যত শেয়ারের মালিক তার মোট মূল্যের কয়েকগুণ বেশি। ঐ হিসেব অনুযায়ী, শ্রমিক সাধারণের শতকরা ৯৭·৩ জনই শেয়ার মালিকানার সামান্যতম সুযোগের থেকেও বঞ্চিত। আর অন্য দিকে, দেশের পরিবার-সমষ্টির মাত্র শতকরা ১ ভাগ শতকরা ৮০ ভাগ শেয়ারের মালিক।

তিন: ১৯৪৯ সালে যে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে তার মোট মূল্যের শতকরা ৪২ ভাগই পেয়েছে ১৬৫,০০০ শেয়ার মালিক বা প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন জনসাধারণের মাত্র শতকরা এক ভাগের এক-দশমাংশ।[১৩] অপর দিকে 'শ্রমিক-মালিক'দের শেয়ার মালিকানা থেকে গড় বার্ষিক আয় হলো মাত্র দু-দিনের মজুরীর সমান অর্থাৎ বৃহৎ শেয়ার মালিকদের বিপুল পরিমাণ মুনাফার তুচ্ছাতিতুচ্ছ অংশ।[১৪] এসবই শেয়ার-মালিকানা গণতন্ত্রীকরণের এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের co-proprietors-এ পরিণত করার অতি চমৎকার নিদর্শন!

মহাধনিকদের আধিপত্য

প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমসাময়িক ধনতান্ত্রিক সমাজে সম্পদ বণ্টনে শুধু যে অসাম্য বর্তমান তা নয়, এই সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রবণতাটিও অতি প্রকট। (বিশিষ্ট আমেরিকান অর্থনীতিবিদ এফ. সি. মিলসের হিসেব অনুসারে[১৫]) বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হ্রাস পায় এক-পঞ্চমাংশ, আর একই সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি। মার্কিন সরকারী অনুসন্ধানের থেকে জানা যায়,[১৬] ২০০টি বৃহত্তম উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ১৯৩৫ সালে ব্যবসায়ে অংশ ছিল ৩৮ শতাংশ; ১৯৫০ ও ১৯৫৫ সালে অংশ বেড়ে গিয়ে হয় যথাক্রমে ৪১ শতাংশ ও ৪৬ শতাংশ।

এই একচেটিয়া প্রবণতা বৃদ্ধি এতই প্রকট যে মার্কিন দেশে "ইতিহাসের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি একত্রীভূত (concentrated) অর্থনৈতিক মালিকানা"র কথা 'বিংশ শতাব্দীর ধনতান্ত্রিক বিপ্লব'-এর গ্রন্থকার স্বয়ং বার্লকেও মানতে হয়েছে। তিনি লিখেছেন, দেশের প্রতিটি শিল্পের, প্রতিটি

ব্যবসার অর্ধেকেরও বেশি দুটি বা তিনটি বা খুব বেশি হলে পাঁচটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত।[১৭]

প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলি নাকি এই একচেটিয়া প্রবণতা থেকে মুক্ত। কিন্তু এ দাবি যে ভিত্তিহীন তার প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, সুইডেনের মতো দেশেও ১৯৩০ থেকে ১৯৫০—এই ২০ বৎসরের মধ্যে দেশের মোট ব্যবসায়ে ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অংশ শতকরা ১৮ ভাগ থেকে কমে হয়েছে শতকরা ১১ ভাগ, আর বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলির অংশ শতকরা ২১ ভাগ থেকে বেড়ে হয়েছে শতকরা ২৮ ভাগ।[১৮]

প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি ধনতান্ত্রিক দেশেরই বৈশিষ্ট্য এই একচেটিয়া প্রবণতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জগতে তো দু-শ বা তিন-শটি দৈত্যাকার শিল্প ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান জেঁকে বসে রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি আবার নানা ভাবে একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ গ্রন্থিবন্ধনে আবদ্ধ। কাঁচামালের যোগান, নতুন উদ্ভাবন, বিনিয়োগের পরিমাণ ও প্রকৃতি, শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্ম-সংস্থান, পণ্যদ্রব্যের মূল্য, বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থাদি যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় এই অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে। শিল্প-অর্থ-বাণিজ্যের জগতে তো বটেই, এমন কি গোটা সমাজে ব্যক্তির চিন্তা, ক্ষমতা, খ্যাতি—সবেরই ভিত্তি এই প্রতিষ্ঠানগুলি। এই প্রতিষ্ঠানগুলিই, ক্ষমতা ব্যবহার করার, সম্পদ আহরণ ও সঞ্চয়ের প্রধানতম উপায়। এই বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা দিয়েই নির্ধারিত হয় ব্যক্তির ঐশ্বর্যের পরিমাণ, ক্ষমতার ব্যাপ্তি, খ্যাতির শিখর। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির এই সত্যকে খণ্ডন করার কোনো উপায়ই নেই।

'আয়গত বিপ্লব'

যে অর্থনৈতিক বন্দোবস্তে সম্পত্তির বণ্টনে তীব্র অসাম্য এবং শিল্প-আর্থিক-ব্যবসা জগতে প্রবল একচেটিয়া-কর্তৃত্ব বিদ্যমান, সে ব্যবস্থায় আয়ের বণ্টনও যে অনুরূপ হবে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। জাতীয় আয়ের শ্রেণীগত বণ্টন সম্পর্কে যেসব অনুসন্ধান করা হয়েছে, সে অনুসন্ধানগুলির ফলাফল অবশ্য অবিকল এক নয়। গত কয়েক দশকে জাতীয় আয় বণ্টনের প্যাটার্নে বিশেষ যে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি তা এই অনুসন্ধানগুলির থেকে বেশ বোঝা যায়। জন স্ট্র্যাচি তো 'কল্যাণ রাষ্ট্র'-র তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী।

কিন্তু তাঁকেও মানতে হয়েছে যে[১৯], ১৯১১-১৯৩৯—এই কয় বৎসরে জাতীয় আয়ের মধ্যে একদিকে শ্রমিক-কর্মচারীর মজুরী ও বেতন, অন্যদিকে মালিককুলের মুনাফা, খাজনা ও সুদের আপেক্ষিক অংশ মোটামুটি অপরিবর্তিত রয়েছে।

প্রগতিশীল ধনতন্ত্রের পক্ষে যাঁরা ওকালতনামা নিয়েছেন তাঁরা বলছেন, আগে যাই হোক না কেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে নাকি একটা 'আয়গত বিপ্লব' ঘটে গেছে। এর ফলে জাতীয় আয়ের মধ্যে সম্পত্তিজাত আয়ের অংশ কমেছে, আর শ্রমজাত আয়ের অংশ বেড়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ষ্ট্র্যাচির নিজস্ব জবানীতেই জানা যায়, সম্পত্তিজাত আয়ের মধ্যে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আয় অর্থাৎ যে আয় বিতরণ করা হয়েছে তাকেই হিসেবের মধ্যে ধরা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিপুল মুনাফার যে অংশটি বণ্টন না করে রিজার্ভ ফাণ্ডে বা অন্যান্য বাবদে জমা রাখা হয় তাকে ধরা হচ্ছে না। কিন্তু এই undistributed profit বা অবিতরিত মুনাফা তো কার্যত ধনিকদের শ্রেণীগত আয়।

এ দিকটি মনে রেখে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন বিশেষ পরিস্থিতিতেও জাতীয় আয় বণ্টনের ধারায় তেমন কোনো পরিবর্তন আসে নি। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট ইংরেজ অর্থনীতিবিদ ডাডলে সীয়ার্সের অনুসন্ধান থেকে জানা যায়,[২০] ইংল্যাণ্ডে মোট উপার্জকদের মধ্যে সর্বোচ্চ আয়বিশিষ্ট ১ শতাংশ ১৯৩৮ সালে আত্মসাৎ করত জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ, ১৯৪৭ সালে এদের ভাগ মাত্র ১ শতাংশ কমে হয়েছে ১৯ শতাংশ। পক্ষান্তরে উপার্জক সমষ্টির মধ্যে নিম্ন আয়বিশিষ্ট ৫০ শতাংশের ভাগে ১৯৪৭ সালে পড়েছে জাতীয় আয়ের মাত্র ২৫ শতাংশ—এক্ষেত্রে ১৯৩৮ সালের তুলনায় প্রায় কোনো উন্নতিই ঘটে নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয় বণ্টনের ধারাও ভিন্ন নয়। সাইমন কুজনেট্স-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী[২১] ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৯ মাত্র এক-পঞ্চমাংশ।

'ম্যানেজারিয়েল বিপ্লব'-এর অতিকথা

আগেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, জাতীয় আয় বণ্টনে এই যে উৎকট অসাম্য, এর মূলে রয়েছে কয়েক শ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া কর্তৃত্ব। আর এই প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয় মালিক গোষ্ঠীর স্বার্থে, মালিক গোষ্ঠীর দ্বারা।

ধনতন্ত্রের নবীন ত্রাণকর্তারা অবশ্য বলছেন ইংল্যাণ্ড বা মার্কিন দেশে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটছে। বিরাট বিরাট মনোপলি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার এবং আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির বিশেষ জটিলতা বৃদ্ধির ফলে এসব দেশে ধনিক বা মালিকশ্রেণী দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন তো বটেই, এমন কি নিজেদের মালিকানাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উৎপাদন সংগঠনসমূহে কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ক্ষমতা ক্রমশ হারাচ্ছেন। তাঁদের পরিবর্তে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক্ত সর্বোচ্চ কর্মকর্তারা বা ম্যানেজার ও টেকনোলজিস্টগোষ্ঠী বিভিন্ন শিল্প ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় সর্বেসর্বা। রান্নাঘরের জন্য রেফ্রিজারেটার থেকে সুরু করে যুদ্ধের প্রয়োজনে বোমারু বিমান উৎপাদন—সব কিছুর ক্ষেত্রেই এই বেতনভুক বড় সাহেব বা ম্যানেজারগোষ্ঠী প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। 'পুরনো দিনের সঙ্কীর্ণ মনোভাবাপন্ন মালিককুল' থেকে এদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র—অনেক ব্যাপক ও প্রসারিত। যে বিশেষ প্রতিষ্ঠানে এরা নিযুক্ত কেবলমাত্র সেই প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষা নয়, ছোট উৎপাদক, ক্রেতাসাধারণ ও শ্রমিক-কর্মচারীদের বহুবিধ স্বার্থরক্ষার কাজে এরা ব্যাপৃত। এদের লক্ষ্য মুনাফাশিকার নয়—এদের লক্ষ্য জনকল্যাণ ও জনসেবা।

মজা হলো যে, পণ্ডিতরা ম্যানেজারিয়েল বিপ্লবের দাবি ঘোষণায় যে পরিমাণ সোচ্চার এই দাবিকে যুক্তিতথ্য প্রমাণসহ প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ঠিক সে পরিমাণেই নীরব। গলব্রেথ, স্ট্র্যাচি, ক্রসল্যাণ্ড বা অন্য যে কোনো 'বিশেষজ্ঞ'-র লেখাই দেখা যাক না কেন, এই তত্ত্বের সমর্থনে তথ্যের অনুসন্ধান পণ্ডশ্রম মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে এঁদের সকলের সিদ্ধান্তেরই একটি সাধারণ ভিত্তি আছে। তা হলো ১৯৩৩ সালে গার্ডনার মীনস ও এ. এ. বার্লে রচিত 'The Modern Corporation and Private Property' বইটি। ঐ বই-এ উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে, জেমস বার্নহাম লেখেন 'Managerial Revolution।[২২] প্রথমোক্ত বইটিতে লেখকদ্বয় আধুনিক উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে অনেক পরিশ্রম করে প্রচুর মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সে-সবের আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। এখানে যা প্রাসঙ্গিক ও উল্লেখযোগ্য তা হলো ঐ লেখকেরা দেখিয়েছিলেন, ১৯২৯ সালে ২০০টি যৌথ মূলধনী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৬৫টিই কার্যকরীভাবে ম্যানেজার নিয়ন্ত্রিত।

সত্য হলে উপরোক্ত তথ্য নিঃসংশয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু পরবর্তীকালে

মার্কিন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত Securities and Exchange Commission-এর মতে[২২] ঐ ২০০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪০টিই মালিক নিয়ন্ত্রিত। ঐ লেখক দুজন ৩৬টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ করে ম্যানেজার নিয়ন্ত্রিত হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের বিভিন্ন সরকারী কমিটির অনুসন্ধানের ফলাফল থেকে জানা যায়, এদের ততটিই নিশ্চিতভাবে মালিকানা নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান।

ম্যানেজারিয়েল বিপ্লব যে একটা অতিকথা বা myth ভিন্ন কিছু নয়, তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেকার নানা বিশ্লেষণ থেকেও প্রমাণিত হয়। অধ্যাপক ম্যাবেল নিউকামারের অনুসন্ধান অনুসারে ১৯৪৯ সালে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলির ৫ হাজার পরিচালক বা ডাইরেক্টারের মধ্যে শতকরা মাত্র ৩৭·৩ জন ছিলেন বেতনভুক কর্মকর্তা।

ইংল্যাণ্ডেও পরিস্থিতি ভিন্নতর কিছু নয়। সেখানকার শিল্প-কাঠামো ও সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা করে অধ্যাপক সার্জেন্ট ফ্লোরেন্স লিখেছেন,[২৩] "ম্যানেজারিয়েল বিপ্লব যতটা অগ্রসর হয়েছে বলে চিন্তা করা হয় (বা চিন্তা না করেই বলা হয়) তা যে হয় নি এবং অনেক কোম্পানী ও কর্পোরেশনেরই সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা যে বৃহৎ শেয়ার মালিকদের হাতেই ন্যস্ত—একথা বিশ্বাস করার মতো নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে।"

মালিকগোষ্ঠী ও ম্যানেজারগোষ্ঠীর সমস্বার্থবোধ

একথা যথার্থ যে, আধুনিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বেতনভুক কর্মকর্তা বা ম্যানেজারগোষ্ঠীর ক্ষমতা ও ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাদের এই ক্ষমতার ভিত্তি বা উৎস কোথায়? এই ম্যানেজারগোষ্ঠীর স্বার্থ কি মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থ থেকে ভিন্ন এবং যদি তা ভিন্ন হয়, তবে সেই বিশেষ স্বার্থ টি কি ?

এসব প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথম কথা হলো, দৈত্যাকার বিরাট একচেটিয়া শিল্প ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিই ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংগঠিত কেন্দ্র। বেতনভুক কর্মকর্তারা এই সম্পত্তি-কাঠামোর একাধারে ফল এবং সংগঠক। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সম্পর্কের নৈকট্যের মাত্রা দিয়েই নির্ধারিত হয় ম্যানেজারগোষ্ঠীর বিত্ত, ক্ষমতা, সুবিধা, যশের পরিমাণ।

দ্বিতীয়ত: মালিকগোষ্ঠী ও ম্যানেজারগোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থের ভিন্নতা ও

বিরোধ নয়, বরং ঘনিষ্ঠ সমস্বার্থবোধ বর্তমান। এবং এই সমস্বার্থবোধের ভিত্তি প্রধানত তিনটি।

এক : অধ্যাপক রাইট মিলস তাঁর 'Poner Elite' বইতে দেখিয়েছেন, ১৯৫০ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষস্থানীয় মালিক ও কর্মকর্তাদের অধিকাংশেরই জন্ম অন্তত উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারে; এদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ধর্মবিশ্বাসে প্রোটেস্ট্যান্ট, প্রায় সকলেরই চামড়ার রং সাদা; বেশির ভাগেরই শিক্ষা বাছাই করা বিশিষ্ট কলেজ ও প্রতিষ্ঠানে। পারিবারিক ও শিক্ষাগত পৃষ্ঠপটের এই মিল, জীবনযাত্রার ঢং-এ সাদৃশ্য এবং একই ধরণের ক্লাব, খানাপিনার আসর ইত্যাদিতে সামাজিক মেলামেশার মধ্যে মালিক-গোষ্ঠী ও ম্যানেজারগোষ্ঠীর সামাজিক ও মানসভঙ্গিগত ঐক্যের কারণ নিহিত।

দুই : মালিকগোষ্ঠী ও ম্যানেজারগোষ্ঠীর সমস্বার্থবোধের কারণ অবশ্য শুধুমাত্র সামাজিক নয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সম্পত্তি-কাঠামোর বিশিষ্ট প্রকৃতির মধ্যেও উপস্থিত রয়েছে এই সমস্বার্থবোধের কারণ। 'ম্যানেজারিয়েল বিপ্লব'-এর প্রবক্তারা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, জনসেবাই ম্যানেজারগোষ্ঠীর লক্ষ্য। মনোগত অভিপ্রায় প্রমাণ করা অবশ্য যথেষ্ট তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু সে তর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেও বলা যায়, মনোগত অভিপ্রায় যাই হোক না কেন, ম্যানেজারগোষ্ঠীর জীবনের বাস্তব ব্রত জনসেবা বা জনকল্যাণ নয়, মালিকের সেবা। শ্রমিক-কর্মচারী, ক্রেতাসাধারণ, কারিগর ও ছোট উৎপাদক—এদের সকলের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে মালিকের স্বার্থরক্ষাই ম্যানেজারগোষ্ঠীর একমাত্র জীবনসাধনা। কারণ মালিকের প্রসাদলাভে এদের তুষ্টি, মালিকের অনুগ্রহ বর্ষণে এদের পদোন্নতি, মালিকের কৃপাদৃষ্টিতে এদের প্রতিষ্ঠা। আর মালিকের স্বার্থরক্ষার মানে হলো অর্থ, আরও অর্থ, মুনাফা অর্জন।

তিন : বস্তুতপক্ষে ধনতান্ত্রিক বন্দোবস্তের চৌহদ্দিতে মুনাফাশিকার ভিন্ন অন্যবিধ কোনো লক্ষ্যের; মুনাফা নিরপেক্ষ কোনো উদ্দেশ্যের অনুসরণ, মালিক-গোষ্ঠী কিংবা ম্যানেজারগোষ্ঠীর কারুর পক্ষেই সম্ভবপর নয়। আগেই বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মাত্রা দিয়েই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিত্ত-ক্ষমতা-খ্যাতির পরিমাণ নির্ধারিত। আর ধনতান্ত্রিক বন্দোবস্তে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিশিষ্ট, নির্দিষ্ট রূপ হলো মূলধনের মালিকানা, পরিচালনা,

রক্ষণাবেক্ষণে অংশ গ্রহণ এবং এ সমাজে ঐশ্বর্য বৃদ্ধির, ক্ষমতা লাভের, প্রতিষ্ঠা অর্জনের সেটিই সহজতম সরলতম পন্থা। কিন্তু মূলধনের স্বাভাবিক সঙ্কোচনের দিকে—প্রতিযোগিতা, কারিগরী উন্নয়ন, নিত্য নতুন উদ্ভাবনাদি নানা উপাদান এ বিষয়ে সক্রিয়। এ অবস্থায় সমাজে নিজের বিত্ত-ক্ষমতা-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার একমাত্র উপায় মূলধনের প্রসারের জন্য ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন প্রযত্ন। আর মুনাফা তো মূলধনেরই increment, মূলধনের প্রসার বা বৃদ্ধির বিশেষ রূপ। অতএব মূলধনের আইনসঙ্গত মালিক ও বেতনভুক বড়সাহেব—এদের সকলেরই, আত্মগত বাসনা যাই হোক না কেন, বাস্তব পরিস্থিতির চাপে মুনাফা অর্জনই একমাত্র উদ্দেশ্য। মালিকগোষ্ঠী ও ম্যানেজারগোষ্ঠীর সমস্বার্থবোধের অন্যতম ভিত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তি-কাঠামোর এই বিশেষত্ব।

উপরের আলোচনা থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, এক বিশ্ববিপ্লবের ফলে মালিকগোষ্ঠী তার ক্ষমতা ও সুবিধা হারিয়েছে, পরিবর্তে ম্যানেজারগোষ্ঠী হস্তগত করেছে সব ক্ষমতা ও সুবিধা—এমন সিদ্ধান্তের তথ্যগত অথবা তত্ত্বগত, কোনো রকম সমর্থনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইংল্যাণ্ডের বাস্তব সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে মেলে না। সে জীবনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষমতা ধারাবাহিক, সেখানে ধনতান্ত্রিক সম্পত্তির স্বার্থই প্রধান কথা, একচেটিয়া ধনিকদের আধিপত্য অপ্রতিহত। এবং দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোয় তার বিশেষ অবস্থানের দরুণ বেতনভুক বড়কর্তাদের গোষ্ঠী এই ধনিকশ্রেণীর থেকে ভিন্ন, স্বতন্ত্র কোনো শ্রেণী নয়—আসলে ঐ শ্রেণীরই একটি অংশ। গত কয়েক দশকে অবশ্য ধনিকদের শ্রেণীগত কাঠামোর অভ্যন্তরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটছে। কিন্তু সে সব পরিবর্তন সত্ত্বেও ম্যানেজারগোষ্ঠী স্বতন্ত্র কোনো শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয় নি, অর্থনৈতিক জীবনে ধনিকশ্রেণীর প্রভুত্বের অবসানও ঘটে নি।

রাষ্ট্রের ভূমিকা

ধনিকশ্রেণীর এই প্রভুত্ব, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রবল ক্ষমতা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক জীবনেই গণ্ডিবদ্ধ নয়, সে প্রভুত্ব ও ক্ষমতা রাজনৈতিক জীবনেও প্রসারিত এবং ক্রমপ্রসারমান।

নব্য ধনতন্ত্রের মুখপাত্ররা কিন্তু বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখাতে চাইছেন।

তাঁদের বক্তব্য হলো, অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকা ক্রমবর্ধমান, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ। শ্রেণী-নিরপেক্ষ কল্যাণব্রতী আমলারাই এ রাষ্ট্রের নিয়ামক-শক্তি, কার্যকরী ক্ষমতার অধিকারী। ফলস্বরূপ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি মৌলিক অর্থেই রূপান্তরিত।

এ নিয়ে অবশ্য তর্কের কোনো অবকাশ নেই যে, মার্কস-এঙ্গেলস যে কালে লিখেছেন সে কালের তুলনায় তো বটেই, এমন কি তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের অবস্থার তুলনাতেও আজকের দিনে রাষ্ট্রের ভূমিকা অনেক বেশি। আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক দেহে দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ, কাঁচামালের বরাদ্দ স্থিরীকরণ, উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে নানাভাবেই রাষ্ট্রের প্রভাব সক্রিয়; কর ব্যবস্থা, শ্রম আইন, শুল্ক নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রত্যক্ষ; রাষ্ট্রের নিজস্ব মালিকানা ও পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খাস মার্কিন মুলুকেও নগণ্য নয়। কিন্তু অর্থনৈতিক কার্যকলাপে রাষ্ট্রের অংশ গ্রহণ মানেই ধনতন্ত্রের অবলুপ্তি নয়।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, ধনতন্ত্রের পূর্বতন চিত্রটি ছিল প্রতিযোগিতামূলক। অসংখ্য ছোট ছোট উৎপাদকের বাধাহীন প্রতিযোগিতার জগতে কোনো একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান অনুপস্থিত, রাষ্ট্রের ভূমিকাও নেতিবাচক। সেদিনের পরিস্থিতিতে ও বিচারে অর্থনৈতিক কার্যকলাপে রাষ্ট্রের কোনো অংশগ্রহণ ছিল অনভিপ্রেত, কোনো হস্তক্ষেপ ছিল অনধিকার চর্চা। এর মানে এ নয় যে, রাষ্ট্রের স্থান ছিল গরীব ও বড়লোকের, শ্রমিক ও মালিকের সংঘাতের উর্ধ্বে বা রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল নিরপেক্ষ আম্পায়ারসুলভ। মোটেই তা নয়। সেদিনও রাষ্ট্র ছিল শ্রেণীশাসনের, সংখ্যাগুরু শ্রমজীবীমানুষের উপর সংখ্যালঘু ধনিকদের জবরদস্তি ও শাসনের যন্ত্র। তবে সেই যন্ত্রের কার্যক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। সেদিনের রাষ্ট্র ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তার, ধনিকদের সঙ্কীর্ণ শ্রেণী স্বার্থের পাহারাদার মাত্র। এবং এ ভূমিকা পালনে রাষ্ট্র যে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নি তার পরিচয় পাওয়া যায় এক-শ বছর আগেকার ইংল্যাণ্ডে প্রতিটি শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থায়, ট্রেড ইউনিয়নের গঠনকে এবং প্রতিটি ধর্মঘটকে বেআইনীকরণে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে এই পুলিশী ভূমিকার অতিরিক্ত কোনো কিছুর জন্য তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতি দাবি করে নি।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্র

কিন্তু তারপর দিন বদলেছে, রাষ্ট্রের ভূমিকাও পালটেছে। বর্তমানে অসংখ্য ধনিকের প্রতিযোগিতার পরিবর্তে মুষ্টিমেয় মহাধনিকেরাই সর্বশক্তিমান, মূলধন একত্রীভূত ও কেন্দ্রীভূত, যুদ্ধের চরিত্র আমূল পরিবর্তিত, সংকটে ধনতন্ত্র জর্জরিত, ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট বিস্তারিত ও ঘনীভূত। এই পরিস্থিতির পশ্চাৎপটে রাষ্ট্রের ভূমিকাও যে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হবে ও ইতিমধ্যেই হয়েছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। রাষ্ট্র আর ধনিকের স্বার্থে শুধু আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক নয়, রাষ্ট্র এখন সামগ্রিকভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো ও ধনিকশ্রেণীর, বিশেষত একচেটিয়া ধনিকের ত্রাণকারী শক্তি।

রাষ্ট্রের এই ভূমিকার প্রকাশ নানাবিধ: ধনিকশ্রেণীর সাধারণ স্বার্থ রক্ষার তাগিদেই রাষ্ট্র কখনও মজুরীর সর্বোচ্চ সীমা নিয়ন্ত্রণ করছে, কখনও বা নির্ধারণ করছে ধনিকশ্রেণীর মুনাফার অনুকূল কর-কাঠামো ও আমদানী-রপ্তানীর নীতি, আবার কখনও ধনিকশ্রেণীকে গ্যারান্টি দিচ্ছে আইনত নির্দিষ্ট মুনাফার, কখনও আবার পরিবহনব্যবস্থা পরিচালনার কিংবা শক্তি-উৎপাদন ইত্যাদির সরাসরি দায়িত্ব ও ঝুঁকি গ্রহণ করে ধনিকশ্রেণীকে সস্তায় এইসব সুযোগ সরবরাহ নিশ্চিত করছে (ইংল্যাণ্ডে যুদ্ধপরবর্তী প্রথম লেবার সরকারের আমলে ক্রমশ লোকসানজনক রেলপথ, কয়লাখনি ও বিদ্যুৎশিল্পের জাতীয়করণ এই ধরনের কাজের নমুনা), কখনও রাষ্ট্র ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প-ব্যবসায়ের বৃহত্তম খরিদ্দার হিসেবে আগাম অর্ডার দিয়ে ধনিকদের বাজারকে করে দিচ্ছে নিশ্চিত, সম্পাদন করা হচ্ছে আন্তর্রাষ্ট্রীয় ব্যাপক চুক্তি (যেমন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও লাক্সেমবার্গ—এই ছয়টি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত European Steel and Coal Community ও European Common Market), আধুনিক মারণাস্ত্র সরবরাহের ঠিকা দেওয়া হচ্ছে একচেটিয়া ধনকুবেরদের, প্রয়োজনমতো উপনিবেশগুলিতে চালানো হচ্ছে হিংস্র লড়াই কিংবা আয়োজন করা হচ্ছে নতুন যুদ্ধের। ১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ গায়েনার প্রগতিশীল সরকারের উচ্ছেদ এবং গত বৎসর কিউবায় মার্কিন বোম্বেটে আক্রমণ 'কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র'-র পক্ষ থেকে মহাধনিকদের সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার যে প্রয়াস, তারই দুটি খুব বড় নমুনা।

উপরে উল্লিখিত নানা কাজ ও ব্যবস্থাবলী একই নীতির রকমফের।

লক্ষ্য নির্দিষ্ট, অভিন্ন—মুনাফার উদ্দেশ্যে মূলধনের ব্যবহার। অর্থাৎ ধনিক-শ্রেণীর এবং বিশেষত ও মুখ্যত একচেটিয়া ধনকুবেরদের বিপুল সম্পত্তি ও স্বার্থ সংরক্ষণ। স্পষ্টতই একাজ যথেষ্ট দুরূহ ও জটিল। ধনিকশ্রেণীর ভিতরে রয়েছে নানা গোষ্ঠী ও স্তর ভেদ, তাদের মধ্যে রয়েছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আশু স্বার্থের ক্ষেত্রে রয়েছে নানা পার্থক্য ও সংঘাত। এরকম অবস্থায় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনে কখনো-কখনো ধনিকদের গোষ্ঠী ও অংশবিশেষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে, তার বিরুদ্ধে সমালোচনা ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ ও কার্যকলাপে, দেশের সকল স্তরের মানুষের প্রভাব ও ইচ্ছার তুলনায় ধনিকদের এবং প্রধানত একচেটিয়া ধনিকদের প্রভাব ও ইচ্ছাই চূড়ান্ত। রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ ও ব্যবস্থাবলীর এই প্রকৃতি ধনতন্ত্র বা একচেটিয়া ধনতন্ত্রের রূপান্তর তো সূচিত করেই না, বরং সূচিত করে রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে একচেটিয়া ধনকুবেরদের ঘনিষ্ঠ গ্রন্থিবন্ধন এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিকাশ।

প্রসঙ্গক্রমে বলে নেওয়া প্রয়োজন, অর্থনৈতিক কার্যকলাপে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ যে ধনতন্ত্রের বিরোধী নয়, বরং তার সঙ্গে অনেক সময়ে সঙ্গতিপূর্ণ—একথার সাক্ষ্য শুধু সম্প্রতিকালের ঘটনাবলীতেই পাওয়া যায় তা নয়, একথার সাক্ষ্য ধনতান্ত্রিক বিকাশের অতীত ইতিহাসেও মেলে। নির্ভেজাল laissez faire বা অবাধ প্রতিযোগিতার সাক্ষাৎ একটা বিশেষ সময়ে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা মার্কিন দেশে মিলেছে ঠিকই। কিন্তু ইতিহাসের পাঠকমাত্রেরই জানা আছে, ধনতান্ত্রিক বিকাশের গোড়ার দিকে Mercantile Capital-এর প্রসার ঘটেছে সরাসরি রাষ্ট্রেরই পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থনে। আর জার্মানী ও জাপানে ধনতন্ত্রের বিকাশ একেবারে গোড়া থেকেই রাষ্ট্রীয় উদ্যমে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পক্ষপুটে। অবশ্য তফাৎ আছে, সেকাল আর একালে অনেক তফাৎ। সেদিনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছিল উদীয়মান নবীন ধনিকশ্রেণীর বিকাশের প্রয়োজনে, আর আজকের হস্তক্ষেপ ঘটছে ধনতন্ত্রের শেষ দশার কালে নেহাৎ আত্মরক্ষার তাগিদে। কিন্তু সে যাই হোক, আসল কথা হলো, অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের অংশ গ্রহণই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে পাল্টে কিংবা বাতিল করে দেয় না। কেননা রাষ্ট্রের ভূমিকা ও অবস্থান কোনো কালে কোনো দেশে কোনো ভাবেই ধনী ও নির্ধন, সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীনদের

সংঘর্ষের উর্ধ্বে নয়। রাষ্ট্র সব দেশে সব কালে সম্পত্তিবানদের, শাসকশ্রেণীর নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির উপায়, এবং বর্তমানকালে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধনিকদের, বিশেষত একচেটিয়া ধনিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি-কাঠামো সংরক্ষণের যন্ত্র।

গলব্রেথ ও অন্য অনেকে অবশ্য খুব জোর গলায় বলছেন, রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের সঙ্গে ধনিকশ্রেণীর সম্পর্ক ক্ষীণ। কিন্তু আইসেনহাওয়ারের শাসনকালে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক ও প্রধান আমলাদের অনেকেই যে শিল্প-আর্থিক-বাণিজ্য জগতের শিরোমণিদের অতি ঘনিষ্ঠ ছিল বা অনেকে যে সরাসরি ঐ জগতের প্রতিনিধি ছিল তার বেশ কিছু নমুনা অধ্যাপক রাইট মিলস দিয়েছেন। 'ডেমোক্রাট' কেনেডির শাসন পরিষদেও দেখা যাচ্ছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রবার্ট ম্যাকনামারা ফোর্ড মোটর কোম্পানীর প্রাক্তন সভাপতি, অর্থমন্ত্রী ডগলাস ডিলন একটি বৃহৎ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সভাপতি, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডীন রাস্ক রকফেলার ফাউনডেশানের প্রাক্তন সভাপতি। অর্থাৎ প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও অর্থ—এই তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের নীতিনির্ধারণের চাবিকাঠিটি শুধু ধনিকশ্রেণীর নয়, একেবারে শীর্ষস্থানীয় একচেটিয়াপতিদের প্রতিনিধিদের দখলে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সম্পত্তিবানদের এরকম সরাসরি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আরও বহু নমুনাই দেওয়া যায়।

প্রশ্ন হতে পারে: রাষ্ট্র যদি বাস্তবিকই সম্পত্তিবানদের শ্রেণীগত স্বার্থ-সিদ্ধির উপায়মাত্র হয়, তবে কেমন করে সম্পত্তিবানদের, এমন কি একচেটিয়া ধনকুবেরদের অধিকার ও স্বার্থকে সঙ্কুচিত করে আইন গৃহীত হয়, কেমন করেই বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শ্রমিক কল্যাণমূলক নানা ব্যবস্থাদি প্রবর্তিত হয়?

এ প্রশ্নের উত্তর কঠিন নয়। সম্পত্তিবানদের বিরুদ্ধে সম্পত্তিহীনদের সপক্ষে আইন ও ব্যবস্থাদি গৃহীত হয় শেষোক্তদের আন্দোলন ও সংগ্রামের চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে, তাদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্য, 'আইন ও শৃঙ্খলা'র ভেঙ্গে পড়াকে প্রতিরোধ করার প্রয়োজনে। কিন্তু যে ধরণের আইন ও ব্যবস্থাদি গৃহীত হোক না কেন, তা গৃহীত হয় প্রচলিত সম্পত্তি-কাঠামো অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির চৌহদ্দির ভিতর।

ধনতান্ত্রিক সম্পত্তি-সম্পর্কের পরিবর্তন এই সব আইন-কানুনের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজনমতো কিছু কন্‌সেশান দিয়ে এই সম্পত্তি-সম্পর্ককে

অক্ষুন্ন রাখা। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও ধনিকশ্রেণীর কার্যকলাপ, 'বিপদ উপস্থিত হলে পণ্ডিতেরা অর্ধেক ত্যাগ করেন'—এই আপ্তবাক্য প্রয়োগের নমুনাবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা অন্যান্য অনেক ধনতান্ত্রিক দেশে সম্পত্তিবানদের অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে কম আইন-কানুন তো গৃহীত হয় নি। কিন্তু তার ফলে ধনিকেরা তাদের সম্পত্তির উপর মালিকানা ও কর্তৃত্বের অধিকার হারায় নি, সমাজ ও অর্থ-নীতিতে শ্রমিকদের অবস্থানেরও কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। এক-শ বছর ধরে সম্পত্তি-সম্পর্কের ধারাবাহিকতা রয়েছে অব্যাহত—একথা এই প্রবন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে।

ধনতন্ত্রের মূলগত অসঙ্গতি

পরিণতিতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মূলগত অসঙ্গতিও অপরিবর্তিত। প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজে একক, বিচ্ছিন্ন উৎপাদক—কারিগর, কৃষক ইত্যাদি উৎপাদন করত নিজের হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি নিয়ে নিজের বাড়িতে বসে। কিন্তু ধনতন্ত্রের কল্যাণে উৎপাদন প্রক্রিয়ার এই একক, বিচ্ছিন্ন রূপটি পাল্টে গিয়ে হলো সামাজিক ও সহযোগিতামূলক। ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন হলো একই সময়ে, একই সঙ্গে বহু মানুষের, হাজার হাজার শ্রমিকের মিলিত সামাজিক শ্রমের ফসল। কিন্তু হলে কি হবে? নিজেদের শ্রমের ফসলে উৎপাদকের নেই কোনো অধিকার—সে অধিকার ষোল-আনা রয়েছে ধনিকের। অর্থাৎ কারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদির মালিকের। আশ্চর্য মনে হতে পারে—কিন্তু এটাই বাস্তব যে, একদিকে, উৎপাদন প্রক্রিয়া সামাজিক ও সহযোগিতামূলক, অন্যদিকে, উৎপন্ন পণ্যের মালিকানা বা অধিকার ব্যক্তিগত—সম্পত্তিবানেরা ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎ করছে বহু উৎপাদকের সহযোগিতা ও সমবেত শ্রমের ফল। মার্কস-এঙ্গেলস দেখিয়ে-ছিলেন, এই বাস্তবটিই হলো ধনতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনীতির বুনিয়াদী বিরোধ বা মূলগত অসঙ্গতি এবং এই বিরোধের সমাধান আজও ঘটে নি।

ধনতন্ত্রের এই মৌলিক অসঙ্গতি, এই দুঃসমাধেয় অন্তর্বিরোধের লক্ষণ ও প্রকাশ বহুবিধ। জনসাধারণের দারিদ্র্য ও দুর্দশা, অর্থনৈতিক সংকট, মূল্যবান মানবিক ও বস্তুগত সম্পদের অপচয়, যুদ্ধ—এসবই অর্থনৈতিক উপরোক্ত মূল ব্যাধির নানা প্রকাশ ও লক্ষণ। এ প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই

দেখানো হয়েছে, অর্থনৈতিক দারিদ্র্য ও দুর্গতি এখনো সব থেকে সমৃদ্ধ ও উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেরও মর্মান্তিক বাস্তবতা। কিন্তু শুধু তা নয়, রোগের অন্যান্য লক্ষণগুলিও আগের থেকে বেশি ব্যাপক ও গভীর।

সংকটমুক্ত-ধনতন্ত্র

এই লক্ষণগুলির কোনো কোনোটার তীব্রতা হ্রাসের জন্য, বিশেষত অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিবিধানের জন্য বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনেতাদের পক্ষ থেকে চেষ্টার অবধি নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধির ফলে এ ধারণার সৃষ্টিও হয়েছে—অর্থনৈতিক মন্দা ও সংকট এড়ানোর গোপন রহস্যটি সমসাময়িক ধনতন্ত্রের কাছে আর অজানা নেই। বস্তুতপক্ষে সে দাবিই করা হয়েছে নব্যধনতন্ত্রের তত্ত্বজ্ঞদের পক্ষ থেকে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? ১৯৪৫ সালে যুদ্ধশেষের পর কেটে গেছে ১৬ বছর, ১৯২৯-এর Great Depression-এর পর তিরিশ বছরের বেশি। গত ১৬ বছরে মাকিন অর্থনীতিতে, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের ভাষায়, মৃদু অর্থনৈতিক অবনতি বা recession, কিংবা সহজ সরল ভাষায়—অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ থেকে সঙ্কোচন দেখা দিয়েছে চারবার—১৯৪৯, ১৯৫৩, ১৯৫৭ ও ১৯৬০-এ। আর এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, সংকটমুক্ত ধনতন্ত্রের কথা নেহাতই গালভরা প্রচার।

কিন্তু অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন অর্থাৎ বাণিজ্য চক্রের উদ্বর্তনের উপরোক্ত তথ্যটি ভিন্ন উদ্বর্তনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত, যুদ্ধোত্তর কালের প্রথম তিনটি বাণিজ্য চক্রের ঊর্ধ্বগতি বা upswing-এর স্থিতিকাল ছিল যথাক্রমে ৩৭, ৪২ ও ৩৯ মাস বা গড়পড়তা হিসেবে ৩৯⅓ মাস। আর সর্বশেষ বাণিজ্য চক্রের ঊর্ধ্বগতির স্থিতিকাল ছিল ১৯৫৮-র এপ্রিল থেকে ১৯৬০-এর মে পর্যন্ত ২৫ মাস অর্থাৎ গড়পড়তা স্থিতিকালের দুই-তৃতীয়াংশেরও কম।

বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধি পর্যায়ের দৈর্ঘ্যের এই দ্রুত হ্রাস তাৎপর্যপূর্ণ। পল স্যুইজি, লিও হুবারম্যান প্রমুখ বিশিষ্ট মার্কিন অর্থনীতিবিদদের অভিমত হলো—যুদ্ধোত্তরকালে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের অনুকূলে কতকগুলি বিশেষ উপাদান সক্রিয় ছিল; কিন্তু সেগুলির প্রভাব যে ক্রমশ দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে আসছে, সমৃদ্ধিকালের হ্রাস তারই নিশ্চিত ইঙ্গিত।[২৪]

দ্বিতীয়ত: গত ১৬ বছরে ক্রমশ বেশি বেশি কর্মহীন ও কর্মসন্ধানী নাম লেখাচ্ছে বেকারদের পল্টনে—অর্থনৈতিক সঙ্কোচনের সময়ে তো বটেই, এমন কি সম্প্রসারণের সময়েও।[২৫] সবিশেষ তিনটি বাণিজ্য চক্রের ঊর্ধ্বগতির সর্বোচ্চ শিখর ১৯৫৩, ১৯৫৭ ও ১৯৬০-এ বেসামরিক শ্রমিকসমষ্টিতে বেকারের অনুপাত ছিল যথাক্রমে ২·৯, ৪·৩ ও ৪·৯ শতাংশ। নিম্নগতির সর্বনিম্ন তলদেশে [bottom of the downswing] এই অনুপাত স্বভাবতই আরও অনেক বেশি। সরকারী হিসেব অনুসারে ১৯৬১-র প্রথম ভাগে মাকিন দেশের অন্তত অর্ধেক শিল্পাঞ্চলে, ঐ অঞ্চলগুলির শ্রমিকসমষ্টিতে বেকারের অনুপাত ছিল ও শতাংশেরও বেশি—সরকারীভাবেই ঐ অঞ্চলগুলিকে ঘোষণা করা হয়েছে 'দুর্দশাগ্রস্ত' বা 'distressed' বলে। ঐ বছরের ফেব্রুয়ারিতে দেশে মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৫৭ লাখে। এবং এই হিসেবগুলিতে বেকারের সংখ্যা ও অনুপাত বাস্তবের থেকে অনেক কম করে দেখানো হয়েছে একথাই অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন।

তৃতীয়ত: অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা, অব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ভারে মাকিন অর্থনীতি টলোমলো। ১৯২৯-এ মাকিন দেশের মোট উৎপাদন ক্ষমতার ২০ শতাংশই ছিল অব্যবহৃত। ৩২ বছর পরেও এ অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটে নি। ইস্পাত, এ্যালুমিনিয়াম, খনিজ তেল ইত্যাদি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পেই পুরো উৎপাদনক্ষমতাকে ঊর্ধ্বগতির সর্বোচ্চ শিখরেও কাজে লাগানো হচ্ছে না। অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে তো কথাই নেই—১৯৬১-র হিসেবে দেখা যায়, সমস্ত শিল্পের মোট উৎপাদনক্ষমতার ৭৯ শতাংশকে কাজে লাগানো হচ্ছিল, বাকি ২১ শতাংশ উৎপাদনক্ষমতা ছিল অব্যবহৃত।[২৬]

অর্থনৈতিক অচলাবস্থা

এখানে অবশ্য সমস্ত আলোচনাই করা হলো মাকিন অর্থনীতি প্রসঙ্গে। কিন্তু এ আলোচনা মোটামুটি ভাবে গোটা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পর্কেই প্রযোজ্য এবং সে অর্থনীতি সম্পর্কে দুটি বিষয় খুবই পরিষ্কার।

এক: বুর্জোয়া তত্ত্ববাগীশেরা যতই বলুন না কেন, মাকিন তথা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি মোটেই উন্নয়নশীল বা ক্রমবৃদ্ধিমূলক অর্থনীতি নয়। একথা অস্বীকার করার প্রশ্ন আসে না যে, যুদ্ধোত্তরকালীন বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ কতকগুলি কারণ অর্থনৈতিক সম্প্রসারণকে যুদ্ধপূর্ব কালের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী

করে তুলেছিল এবং এখনো সে কারণগুলি কিছু পরিমাণে সক্রিয়। সে কারণগুলি দ্বারা বাণিজ্য চক্রের গতি-প্রকৃতি প্রভাবিত হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু সে কারণগুলি ও তাদের প্রভাব এখানে আলোচনার বিষয় নয়। এখানে যেটুকু বলা প্রয়োজন তা হলো, সে কারণগুলি নেহাতই সাময়িক—বিশেষ পরিস্থিতি-প্রসূত। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে কারণগুলির প্রভাব ক্ষীণ হয়ে এসেছে—একথা মনে করার ভিত্তি যে রয়েছে তা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এর থেকে একথা মনে করে নিলে ভুল হবে যে, এখুনি এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকের অনুরূপ ব্যাপক ও তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেবে। নিকট ভবিষ্যতে তেমন কোনো সম্ভাবনা ক্ষীণ। কিন্তু এটা নিশ্চিত ও যা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে, সাধারণভাবে ধনতান্ত্রিক ও বিশেষত মার্কিন অর্থনীতির সর্বদেহে গভীর stagnation বা অচলাবস্থার লক্ষণগুলি অতি প্রকট—তীব্র ভাবেই প্রকট!

অপচয় ও অপব্যবহার

দুই : মার্কিন তথা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি তর্কাতীত অর্থে অপচয় ও অপব্যবহার-মূলক। শুধু নিম্নগতির সময়ে নয়, ঊর্ধ্বগতির সময়েও মানবিক ও বস্তুগত সম্পদের অপচয় বিপুল। এবং যে অপচয় ও অপব্যবহার কেবলমাত্র বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি কিংবা উৎপাদনক্ষমতার অপব্যবহারেই সীমাবদ্ধ নয়। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ নিযুক্ত রয়েছে সমাজ ও ব্যক্তির প্রকৃত প্রয়োজন-মাফিক উৎপাদনের কাজে নয়, তারা রয়েছে দৈত্যাকার কারবারগুলির বিজ্ঞাপন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেলসম্যানশিপ, জনসংযোগ রক্ষা, ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার কৌশল উদ্ভাবন, শেয়ার বাজারে দালালী, ফাটকাবাজি, পরমাশ্চর্য সব বিলাস-সামগ্রীর উৎপাদনাদির কাজে। এদের শ্রম, বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি, মেধা—সবই অনুৎপাদক কাজে, অনেক ক্ষেত্রে সমাজবিরোধী কিন্তু আইনসঙ্গত কাজে অপব্যবহৃত ও অপচয়িত।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এই অপচয়ের সবচেয়ে বড় নমুনা—যুদ্ধ।

যুদ্ধ নিয়ে আসে লক্ষ লক্ষ নরনারীর বিপুল বিপর্যয়; আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন—সবই হয়ে যায় তছনছ; কত বাসগৃহ, স্কুল-কলেজ, হাঁসপাতাল, মিউজিয়ম, কারখানাবাড়ি, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কৃষিক্ষেত পরিণত হয় ধ্বংস-

স্তূপে। বাস্তব ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব হয়তো করা যায়। কিন্তু অগণ্য মানুষের চোখের জল আর বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস, প্রিয়জন হারানোর বেদনা আর আশাভঙ্গের যন্ত্রণার পরিমাপ করবে কে?

তথাপি যুদ্ধ হয়। কেননা তাতে রয়েছে ধনতন্ত্রের স্বার্থ। যুদ্ধকালের বিশেষ পরিস্থিতিতে সম্ভবপর হয় লক্ষ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান, বিরাট বাড়তি উৎপাদনক্ষমতার পুরোপুরি ব্যবহার। তদুপরি মারণাস্ত্রের উৎপাদন ও মৃত্যুর ব্যবসায়ে মুনাফা প্রচুর!

তাই লোকায়ত ধনতন্ত্রের আমলেও চলছে অর্থনীতির সামরিকীকরণ, মারণাস্ত্রের উৎপাদন, নিউক্লীয় যুদ্ধের প্রস্তুতি। এই একান্ত স্থূল মুনাফা-সর্বস্বতাই সমগ্র মানবজাতি ও সভ্যতাকে নিয়ে এসেছে সর্বাত্মক মৃত্যু ও ধ্বংসের ভয়ঙ্কর কিনারায়। এই রণসজ্জা বাবদ শুধু ব্রিটেনেই বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ ১,৫০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। মার্কিন দেশে তো এই ব্যয়ের বহর আরও অনেক বেশি।

মার্কস-এঙ্গেলস ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে সিদ্ধান্ত করেছিলেন: "The conditions of bourgeois society are too narrow to comprise the wealth created by them. And how does the bourgeoisie get over these crises? On the one hand by enforced destruction of a mass of productive forces; on the other, by the conquest of new markets, and by the more thorough exploitation of the old ones. That is to say, by paving the way for more extensive and more destructive crises and by diminishing the means whereby the crises are prevented." মার্কসের এই বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের যথার্থতা সম্পর্কে তর্কের যে কোনো অবকাশই নেই তা উপরের আলোচনা থেকেই সুস্পষ্ট। গত এক-শ বছরে উৎপাদনীশক্তি, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার অভাবিত উন্নতি ও বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু উৎপাদনী শক্তির এই বিপুল বিকাশকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির চৌহদ্দিতে একেবারেই অসম্ভব তারই নিদর্শন বেকার পল্টনের সংখ্যা কিংবা বাড়তি উৎপাদনক্ষমতার বোঝা বৃদ্ধি অথবা যুদ্ধের মারফৎ উৎপাদনী শক্তির বর্বর অপচয়।

মনে রাখা দরকার, একদিকে যখন ঘটছে মূল্যবান মানবিক ও বস্তুগত সম্পদের এই নানাবিধ অপচয় ও অপব্যবহার, অর্থাৎ "enforced destruction", ঠিক তখনই অন্যদিকে গোটা ধনতান্ত্রিকজগৎ জুড়ে—এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকায়, স্পেন-পর্তুগাল-দক্ষিণ ইতালি-গ্রীসে, এমন কি অতুলনীয় বৈভবের দেশ কিংবা 'কল্যাণ রাষ্ট্র' খাস মাকিন মুলুকে রয়েছে ভালোভাবে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের অর্থাৎ উপযুক্ত খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়ের অভাব, রোগে ওষুধ ও চিকিৎসার অভাব, অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দুরীকরণের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থাদির অভাব। বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের কাছে নিছক অস্তিত্ব রক্ষাটা তিক্ত বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কিছু নয়। বেন্থামের সেই প্রসিদ্ধ উক্তিকে একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, এখানকার বাস্তবতা হলো: greatest unhappiness of the greatest number.

যে কোনও ন্যায্য, মানবিক সমাজ ও অর্থনীতিতে এটাই কি স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত নয় যে—শিল্পের অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা, কর্মহীন ও কর্মসন্ধানী মানুষদের বুদ্ধি এবং শ্রমশক্তি, যুদ্ধসজ্জা বাবদ বিশাল ব্যয়, নানা ভাবে অপচয়িত ও অপব্যবহৃত সম্পদাদি পুরোপুরি ব্যবহার করা হবে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কাজে লাগানো হবে প্রকৃত প্রয়োজনানুগ দ্রব্যের অর্থাৎ আহার্য পানীয়-পরিচ্ছদ-আশ্রয়ের উৎপাদনে, শিক্ষা-সংস্কৃতি-চিকিৎসার জন্য দরকারী উপকরণ-সমূহের উৎপাদনে কিংবা বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য হ্রাসে, শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী ও বেতন বৃদ্ধিতে, কাঁচামালের উৎপাদন অর্থাৎ কৃষকদের পণ্যের ন্যায্য মূল্যের নিশ্চয়তাদানে অথবা অর্ধোন্নত অঞ্চলগুলির দারিদ্র্য ও দুর্দশার শোকাবহ রূপটির দূরীকরণ অভিযানে? ধনতান্ত্রিকজগৎ-জোড়া এই শোচনীয় দুর্গতির পটভূমিতে 'প্রগতিশীল ধনতন্ত্র'-এ ঘটছে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত।

শ্রেণী-সংঘাতের বাস্তবতা

এই বন্দোবস্তে আসলে উপরোক্ত ব্যবস্থা অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক। কেননা অর্থ, আরও অর্থের জন্য সীমাহীন, অন্তহীন লালসাই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রথম ও শেষ কথা। কৃষিপণ্যের উৎপাদকদের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত করে, শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী হ্রাস করে কিংবা মজুরীর বৃদ্ধি স্থগিত রেখে, ক্রেতাসাধারণের পকেট কেটে অর্থাৎ নানা কায়দায়

শোষণের তীব্রতাকে বাড়িয়ে তুলে, অর্ধোন্নত দেশগুলির জনসাধারণ ও সম্পদকে লুণ্ঠন করে, কোটি কোটি মানুষকে রক্ত ও মৃত্যুর তাণ্ডবে জড়িয়ে ফেলেই একচেটিয়াপতি তথা ধনিকশ্রেণীর সমৃদ্ধি—সংকট মোচনেরও উপায়।

কিন্তু এখানেই রয়েছে ধনতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনীতির অবলুপ্তির বীজ। স্বাভাবিকভাবেই ধনিকশ্রেণীর এই স্থূল, সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সঙ্গে বিরোধ ও সংঘাত সমাজের অন্যান্য সকল শ্রেণীর, এবং বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর। পরিণামে ধনতান্ত্রিকসমাজ শ্রেণী-বিরোধে বিদীর্ণ, শ্রেণী-স্বার্থের সংঘাতে আলোড়িত। সে সংঘাত কখনো প্রকাশ্য, কখনো বা প্রচ্ছন্ন—কোথাও তীব্র, আবার অন্য কোথাও মৃদু। পশ্চিম জার্মানী থেকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, কিউবা থেকে লাওস পর্যন্ত সর্বত্রই এই সংঘাত অনবরত, অবিরাম। একদিকে, মার্কিন দেশে ইস্পাত শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট, পশ্চিম জার্মানীতে শ্রমিক অসন্তোষ, ফরাসী দেশে দ্য গলের personal power-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ইতালিতে ফ্যাসিবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে আন্দোলন, জাপানে বা ব্রিটেনে পারমাণবিক পরীক্ষাবিরোধী কর্মতৎপরতা, ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সাধারণ ধর্মঘট, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আফ্রিকার জাগরণ, ল্যাটিন আমেরিকার সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য আলোড়ন, সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীরণ এবং শান্তির জন্য বিশ্বব্যাপী মহৎ প্রয়াস—অন্যদিকে স্পেনে পর্তুগালে ফ্যাসিস্ত শাসন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টিকে কার্যত বেআইনীকরণ, কঙ্গোয় সাম্রাজ্যবাদীদের নানা কুকীর্তি—এসবই দেশ ও পাত্রবিশেষে মার্কস-এঙ্গেলস কথিত শ্রেণী-সংগ্রামের বিভিন্ন ও বিশেষ রূপ।

শ্রেণী-সমন্বয়ের কথা বলে, 'লোকায়ত্ত ধনতন্ত্র'-র মস্ত বড় আওয়াজটি দিয়ে কিংবা রঙীন কথার জাল বুনে এই তীব্র সংঘাতের বাস্তব সত্যটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মূলগত বিরোধে—সামাজিক উৎপাদন এবং ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার বিরোধে এই শ্রেণী-সংঘাতের ভিত্তি নিহিত।

সমাজে সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীনের, ধনিক ও শ্রমিকের এই যে সংঘাত-তার দূরীকরণ ঘটতে পারে একমাত্র এই সংঘাতের মূলকে উচ্ছেদ করে। এই অবস্থায় একটিমাত্র সমাধানই সম্ভবপর—সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার

পাশাপাশি মালিকানা বন্দোবস্তের সমাজীকরণ। এর অর্থ—বহুজনের মিলিত শ্রমভিত্তিক যে উৎপাদন প্রক্রিয়া বর্তমান, তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মালিকানা সম্পর্কের সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনসাধন; উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর—জমি, খনি, কারখানা ও ব্যাঙ্ক ইত্যাদির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান; পরিবর্তে জনসাধারণের সামাজিক মালিকানার প্রবর্তন। এবং এটাই হলো সমাজতন্ত্র। মার্কস-এঙ্গেলস এই পথের কথাই বলেছেন।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ মানবজাতি ও সভ্যতার জীবনে এক পরম সন্ধিলগ্ন। জীবনের প্রাচুর্য, না মৃত্যুর অন্ধকার: এই হলো আজকের মৌলিক জিজ্ঞাসা। নিঃসংশয়েই এ জিজ্ঞাসার উত্তর: জীবনের প্রাচুর্য। এবং সমাজতন্ত্রই সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একমাত্র পথ। ১৯১৭ সালের পরবর্তী ৪৫ বছরের ইতিহাসে একথার সত্যতা তর্কাতীত।

মার্কস-এঙ্গেলস-এর কি কি বিশ্লেষণ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে, কোন কোন ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা যদি সে তালিকা তৈরি করতে চান, তা তাঁরা নিশ্চয়ই করতে পারেন। কিন্তু ধনিক-শ্রমিক সংঘাতের ক্রমবিস্তার, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মূলগত অসঙ্গতি, সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় ও বিজয়অভিযান সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস-এর বিশ্লেষণের অভ্রান্ততার অগুণতি প্রমাণ যেকোনো চক্ষুষ্মান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছেই ধরা পড়বে।

গ্রন্থপঞ্জী:

১ C. A. R. Crossland—Future of Socialism [পৃঃ ২১]

২ A. A. Berle—The 20th Century Capitalist Revolution

৩ J. K. Galbraith—The Affluent Society

৪ Crossland—ঐ

৫ John Strachey—Contemporary Capitalism

৬ James Burnham—The Managerial Revolution

৭ Leo Huberman—'The Distribution of Income': Monthly Review [July-August 1959]

৮ ঐ

৯ Galbraith—ঐ

১০ Maurice Dobb—Capitalism Yesterday and Today [পৃঃ ১১—১২]

১১ Victor Perlo—'People's Capitalism and Stock Ownership': American Economic Review [June 1958]

১২ V. Perlo—Empire of High Finance [পৃঃ ৩৬—৩৮]

১৩ C. Wright Mills—The Power Elite [পৃঃ ১২১]

১৪ Perlo—ঐ

১৫ F. C. Mills—Economic Tendencies in the United States [পৃঃ ৩০০ থেকে Science and Society, Summer 1961-তে উদ্ধৃত]

১৬ Perlo—ঐ [পৃঃ ২১]

১৭ Berle—ঐ [পৃঃ ২৫—২৬]

১৮ Science and Society [Summer 1961, পৃঃ ২৩২]

১৯ J. Strachey—'Marxism Reinstated' [New Statesman and Nation থেকে Paul Baran-এর 'Political Economy of Growth', [পৃঃ ৬২-তে উদ্ধৃত]

২০ Dobb—ঐ [পৃঃ ৬২]

২১ Paul Baran—ঐ [পৃঃ ৬৩]

২২ Paul Sweezy—The Present as History [পৃঃ ৩৯—৬৬]

২৩ Sargant Florence—The Logic of British and American Industry, [পৃঃ ১৯৩]

২৪, ২৫, ২৬ 'The Economics of Insanity': Monthly Review [January 61]

রক্তকরবীর পাপড়িগুলি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা ব্যাপার রবীন্দ্র-রসানুধ্যায়ীরা সদাই লক্ষ্য করে থাকেন। ব্যাপারটা এই যে তিনি একাধিকবার একই প্রসঙ্গ নিয়ে প্রকরণগত নবীনতর প্রয়াস করেছেন। 'শ্যামা', 'রাজা ও রাণী' প্রভৃতিপ্রসঙ্গ এক্ষেত্রে স্মরণীয়। প্রসঙ্গ-গুলিকে ঠিকমতো প্রকরণসাৎ করার জন্যই যে এই প্রয়াস সেকথা আংশিক সত্য—প্রকরণের আলোকে বিষয়গুলিকে গভীর মূল পর্যন্ত আলোকিত করাই এক্ষেত্রে ছিল শিল্পীর নিগূঢ় অভিপ্রায়। 'শ্যামা'র কাব্য-কাহিনীর রূপ আর তার নৃত্য-গীতিনাট্যময় রূপের পার্থক্যে কেবল প্রকরণগত পার্থক্যই নয়, রসাবদানের পার্থক্যও লক্ষণীয়। কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলীতে এমন একখানি সৃষ্টির সাক্ষাৎ পাচ্ছি যেখানিতে কবির দীর্ঘ শিল্পীজীবনে পরিবেশিত বিভিন্ন প্রসঙ্গই একত্র সমাবেশিত হয়ে এক রসসিদ্ধি লাভ করেছে—অবশ্যই সে রসসিদ্ধির প্রত্যক্ষ মূলে রয়েছে কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। 'রক্তকরবী' সেই গ্রন্থ। পশ্চিমী ধনতন্ত্রের বিকারের মধ্যে কয়েকমাস অতিবাহিত করে কবি যে মানসিক প্রতিঘাতের মধ্যে পড়েছিলেন তা-ই 'রক্তকরবী' রচনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা। আর সেই প্রেরণার টানে কবির দীর্ঘ শিল্পীজীবনের বহু অভিজ্ঞতা, বহু প্রসঙ্গ একত্র সংহত হলো। এ শুধু একই প্রসঙ্গের পূর্বোক্ত রূপান্তরসাধন ও রসের গভীরায়ন নয়। এ হলো বহু-প্রসঙ্গের সমন্বয়ে ভিন্ন রসসৃজন—যে প্রসঙ্গগুলি তিনিই ছড়িয়ে রেখেছিলেন তাঁর সৃষ্টির বিচিত্রপথের নানা প্রান্তে। তাই 'রক্তকরবী'র, রবীন্দ্রনাথের সমগ্রের প্রতিনিধি হবার স্পর্ধা সর্বাপেক্ষা বেশি।

যেসব উপাদান-সমূহের সমাবেশে 'রক্তকরবী'র কথাবস্তুর মূল আকর্ষণ সৃজিত হয়েছে, এবং 'রক্তকরবী'র আত্মা যেসব প্রসঙ্গকে নিজ আলোকে বিভান্বিত করে তুলেছে, পৃথকভাবে দেখতে গেলে সেগুলি সবই পুরাতনপ্রসঙ্গ বলে প্রতিভাত হবে। আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনায় প্রথমে প্রসঙ্গ-গুলির পুরাতনত্ব নিয়ে বিচার করব। পরিশেষে কোন ভাবনাগত কার্যকারণের

সংযোগে এরা 'রক্তকরবী'র আলোকে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে তার কথাও আলোচনা করব।

যে সমস্ত উপাদানের জন্য 'রক্তকরবী'র গল্পে একটা রূপকোত্তর টান বিদ্যমান সেগুলি এই :

[ক] জগৎ বিচ্ছিন্নতা ও তজ্জনিত যন্ত্রণা।
[খ] অন্ধকারের রাজা।
[গ] মহাপ্রতীক্ষা।
[ঘ] কিশোর-প্রেম।
[ঙ] ধ্বংস বা ভাঙন বা উচ্চণ্ড শক্তির পতন।

এই সমস্ত প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের প্রিয়-প্রসঙ্গগুলির অন্যতম। তাঁর সারাজীবনে নানাভাবে এই প্রসঙ্গগুলির পৃথক পৃথক পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এই প্রসঙ্গ-গুলিকে কেমনভাবে ব্যবহার করতে হয়, অনুভূতির কোন স্তরে তারা কী জাতীয় বেদনা সঞ্চার করে, কেমন করে করে, রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তাই 'রক্তকরবী'র রসলোক নির্মাণে এদেরই ডাক পড়েছে জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে।

দুই

জগৎ-বিচ্ছিন্নতা ও তদ্ভূত দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনে প্রথম প্রকাশ্যে দেখা দেয় তাঁর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' কাব্যনাট্যে। অন্ধকার গুহায় অলৌকিক শক্তির সন্ধানী সন্ন্যাসীর স্বেচ্ছানির্বাসন এবং বালিকার সংস্পর্শে সেই জগৎ বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর মূল বিষয়। বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণার বিষয়টি নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো বিচ্ছিন্নতার বোধ বা নৈঃসঙ্গ্যের বেদনা নায়কেরা অনুভব করেছে কোনো একটি চরিত্রের সংস্পর্শে এসে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও 'রক্তকরবী'তে এই নৈঃসঙ্গ্যবোধের উদ্দীপক চরিত্র দুটি হলো নারী। বালিকা এবং নন্দিনী। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এও দেখা যায় জগৎ-বিমুখ, গুহান্ধকারবাসী সন্ন্যাসীর নীরস নিষ্প্রাণতার পটভূমিতে কৃষকদের গোষ্ঠে যাবার গান ধ্বনিত হচ্ছে। 'রক্তকরবী'তেও পৌষের ফসল-কাটার গান যক্ষপুরীর অন্ধকার নিষ্প্রাণতায় মাঝে মাঝে শোনা গেছে। দুটি নাটকেই বিচ্ছিন্নতার মূল দেখানো হয়েছে একই জায়গায়। মানুষ

আপনার প্রাপ্যের সীমাকে ছাড়িয়ে কোনো একটা বাসনাকে উদগ্র করে তোলে। সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে যেটা তত্ত্ববাসনা, কারো কারো কাছে সেটা ধনবাসনা, স্বর্ণ বাসনা। ধনবাদী সভ্যতায় সঞ্চয়লোভী মানুষ ক্রমশই নিজের চারপাশে একটা কারাগার রচনা করে। তার লোভ শুধু তাকেই বন্দী করে না, যারা যারা তার লোভের সঙ্গে কোনো না কোনো প্রকারে সংশ্লিষ্ট সে তাদেরও বন্দী করে। অনিয়ন্ত্রিত বাসনা নিজেই লৌহপ্রাচীর হয়ে ওঠে। পরিশেষে মানুষের হয়তো চৈতন্য হয়। তখনই জন্মলাভ করে জগৎ-বিচ্ছিন্নতা-বোধ, তখনই প্রয়াস জাগে আবার বিশ্বস্রোতের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। অস্বাভাবিকতাই অসুন্দর। তাই অস্বাভাবিকতা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করে সব থেকে বেশি। উদগ্র বাসনার বশবর্তী মানুষ ধরিত্রীর সকল স্বাভাবিকতার কাছ থেকে হাত ছিনিয়ে (গুহাভ্যন্তরে কিংবা) ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হচ্ছে শুধু চূড়ান্ত ব্যর্থতাকে বরণ করার জন্যই একথা রবীন্দ্রনাথ 'স্বর্ণমৃগ' গল্পেও বলেছেন। তবে এই বক্তব্য সেখানে অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট। গল্পের নায়ক আন্তনাথকেই প্রধান করে তুলতে গিয়েছেন বলে গল্পটি গল্পার্থে চরিত্র-প্রধান। বক্তব্যকে রূপকান্বিত করার জন্য সেখানে কোনো প্রয়াস ছিল না। কিন্তু উদগ্র বাসনাই মানুষকে জগৎ-বিচ্ছিন্ন করে, এ ধারণা কাশীর বাড়িতে আন্তনাথের অভিজ্ঞতার সাহায্যে সমর্থিত হচ্ছে।

'গুপ্তধন' গল্পে ব্যাপারটি অধিকতর বক্তব্যগত স্পষ্টতা লাভ করেছে। ভূগর্ভে প্রোথিত গুপ্তধনের জন্য মৃত্যুঞ্জয়ের ঐকান্তিক বাসনা তাকে সহজ স্বাভাবিক সংসারজীবন থেকে দূরে নিয়ে গেল। এমন কি ভূগর্ভের অন্ধকারে রাশীকৃত স্বর্ণসম্পদের সন্ধানও সে পেল। এবং সেই স্বর্ণসম্পদের মাঝখানেই সে বন্দী হলো। সেই স্তূপীভূত স্বর্ণরাশির সোনালি মরুভূমিতেই মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে জাগ্রত হলো জগৎ-বিরহবোধ। 'গুপ্তধন'-গল্পপাঠক মাত্রেই জানেন কী কৌশলে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুঞ্জয়ের স্মৃতিলোককে উদ্ভাসিত করে, তার তৎকালীন জগৎ-বিরহবোধের তীব্রতাকে রূপায়িত করেছেন। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এই ভূগর্ভের রাজত্বে স্বর্ণপ্রহরী মানুষের কথা কল্পনা করেছেন আমাদের দেশেরই প্রচলিত কিম্বদন্তীর কথা স্মরণ করে। কারো সারাজীবনের কার্পণ্যের সঞ্চয় মৃত্যুর পরেও পাহারা দেবার দরকার হলে একজনকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে নাকি মন্ত্রপুত অবস্থায় মেরে ফেলা হতো। সে হতো যক্ষ। 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পে জীবন্ত শিশুকে যক্ষে পরিণত করার বিবরণ রয়েছে। সেখানেও ভূগর্ভের

অন্ধকারে বিলীন হবার প্রাক্‌মুহূর্তে শিশুটির ধরিত্রীর স্বাভাবিক জীবনের প্রতি লোভই ফিরে এসেছে।

অস্বাভাবিকের সন্ধানে মানুষের এই কীটানুগমন জীবনস্রোতের বিপরীতাচরণ। সারাজীবনে রবীন্দ্রনাথ যে একাধিকবার এই প্রসঙ্গ চিন্তা করেছেন তার প্রমাণ আমরা দিলাম। আমেরিকা ভ্রমণের কালে কবির তৎকালীন আমেরিকার অজ্ঞিতাও কবিমানসে অনুরূপ প্রসঙ্গের স্মৃতিকেই ফিরিয়ে এনেছে। তাই যে কথা তিনি বলছেন 'শিশু ভোলানাথ' রচনার পূর্বসূত্র হিসেবে, সে কথার ভেতরেই ধরা পড়ছে 'রক্তকরবী'র পূর্বাভাস। 'রক্ত-করবী'র মূল কল্পনার যেটি বীজস্বরূপ তা যে তখনই কবিকে ক্ষণে ক্ষণে অধিকার করেছিল স্মৃতিকথায় তা স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান। আধুনিক সভ্যতার যে সমস্যা নানাভাবে সারাজীবনই তিনি অনুভব করেছেন সেটা অনেকটা সঠিকমূর্তি পরিগ্রহ করল পশ্চিমী ধনতন্ত্রের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে। 'শিশু ভোলানাথ'-সংক্রান্ত চিঠির পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর তৎকালীন আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে নিজ অনুভূতিকে এই ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

> "In this country I live in the dungeon of the Castle of Bigness. My heart is starved everyday. Here I feel everyday what a terrible nightmare it is for the human soul to bear this burden of monster Arith-matic."

Dungeon শব্দটির মধ্যেও সেই অন্ধ ভূগর্ভের বন্দীশালার চিন্তা প্রকট। এর পরে স্মৃতি হিসাবে উদ্ধার করে বলছেন :

> "কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদ্গারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তু সঞ্চয়ের অন্ধ ভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষ বাষ্পে শ্বাসরুদ্ধ প্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। তখন আমি এই ঘন দেওয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম। সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বাজে, আমার ধ্যানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলুম, আমি ওই পথিকের সহচর। ...দেওয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্য এত বড় আকাশের ফাঁকটাই দরকার।"

রবীন্দ্রনাথ এই শেষের কথাগুলো বলেছেন 'শিশু ভোলানাথ' রচনার পূর্বকথা হিসাবে। কিন্তু 'শিশু ভোলানাথ'-এর প্রথম কবিতাটি ছাড়া 'শিশু ভোলানাথ'-এর আর কোনো কবিতায় "অন্ধ ভাণ্ডারে বদ্ধ জীবনের" প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া আস্বাদন-গোচর হয় না। বরঞ্চ উদ্ধৃত অংশটুকু পড়লে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেন 'রক্তকরবী'র ইতিবৃত্তান্তই বলছেন। এবং প্রত্যক্ষত যাই হোক বস্তুত ব্যাপারটা তাই। 'রক্তকরবী'র মূল পরিকল্পনা আমেরিকা ভ্রমণের কালেই সংগঠিত হয়েছে। আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন তা 'রক্তকরবী' রচনার প্রধান প্রেরণা। এবং এই প্রেরণার টানে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব লেখক-জীবনে বহুকাল পোষিত নানা ধ্যান ধারণার, তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গগুলির সমাবেশ ঘটল 'রক্তকরবী'তে। "অন্ধভাণ্ডারে বদ্ধজীবন" আর "ঘন দেওয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ"ই যক্ষপুরীর বদ্ধজীবন ও তার প্রতিমুখে ফসল-কাটানীদের গানের সুরের পূর্বাভাস। 'গুপ্তধন'-এর মৃত্যুঞ্জয় যেমন করে আবদ্ধ পাতালপুরীতে স্মরণ করেছিল বাইরের অনাড়ম্বর স্বচ্ছন্দ জীবনধারাটাকে এবং এই অনিবার্য স্মৃতির জন্যই যেমন তার জগৎ-বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা হয়ে উঠেছিল তীব্র, 'রক্তকরবী'তেও দেখা যায় কতকটা সেইভাবেই যক্ষপুরীর বদ্ধজীবনের অন্ধ আকাশে "আজ নবান্নের দিন" প্রমুখ স্মৃতি জেগে উঠেছে। নিংড়ে নেওয়া মানুষগুলোর নিক্ষিপ্ত অবশেষের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নন্দিনীর যে একরাশ স্মৃতিকথা মনে পড়েছে তাতে যক্ষপুরীর অন্ধকারে জগৎ-বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারটিই তীব্র হয়ে উঠেছে।

তিন

অন্ধকারের রাজার প্রসঙ্গ রবীন্দ্রচেতনায় দীর্ঘকাল বিরাজিত। অন্ধকারের স্বামী, অন্ধকারের নাথ বা প্রভুর কথা কবির গানে অনেকবার ধ্বনিত হয়েছে। গীতিকবিতার এই অন্ধকারের স্বামী নাথ বা রাজা পূর্ণ পরিণতি লাভ করল 'রাজা' নাটকে। এই অন্ধকারের রাজা আর 'রক্তকরবী'র অন্ধকারের রাজা স্বভাবতই এক নয়। 'রক্তকরবী'র যিনি রাজা তিনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসীর বিপরীত রূপ। কিন্তু উভয়ের জীবনেই সমগ্রতার বিচ্যুতি লক্ষণীয়। "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয়ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।" "যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধ তমসের মধ্যে প্রবেশ করে; তদপেক্ষাও ভূয় অন্ধকারের

মধ্যে প্রবেশ করে তাহারা, যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।" 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ সন্ন্যাসীর গুহান্ধকার ও 'রক্তকরবী'তে রাজার যক্ষপুরীর অন্ধকার এইখানে কথিত অন্ধ তমসেরই রূপক। সমগ্রতাবিচ্যুত খণ্ডিত জীবনের অন্ধকারই এখানে মূর্ত। কিন্তু তা বলে গীতিকবিতায় যে অন্ধকারের প্রভু বা স্বামীকে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা' নাটকে পূর্ণাঙ্গ করে তুললেন তার সঙ্গে 'রক্তকরবী'র রাজা-কল্পনার কোনো সম্পর্ক নেই একথা যেন আমরা না ভাবি। 'রাজা' নাটকে যিনি রাজা মাধুর্যের পথেই তিনি বেদ্য বটে—কিন্তু অগ্নিদাহ সৃষ্টি করার মতো ক্ষমতাও তাঁর আছে। তাপের পথে তাঁকে পাওয়া যাবে তাপের শীর্ষে যিনি বিরাজমান।[1] 'রক্তকরবী'র যিনি রাজা তাঁর শক্তির ঐশ্বর্য নেই। কিন্তু তিনিও শক্তির অধিপতি। এবং শক্তির অধিপতি বলেই রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার রাজাদের মতো তাঁরও আবির্ভাব ভাঙনের পথে। 'খেয়া'র আগমন কবিতায় এবং 'গীতিমাল্য'-এ "যে রাতে মোর দুয়ারগুলি…" গানে প্রথমটিতে প্রত্যক্ষভাবে রাজার কথা ও দ্বিতীয়টিতে পরোক্ষভাবে রাজার অনুষঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। দুটিতেই দুর্যোগের পটভূমিকে ব্যবহার করা হয়েছে। ঝড়ের রাতের রাজা দুয়ার ভেঙে ফেলছেন এ রূপকত্ব 'রক্ত-করবী'তে নেই। রাজা নিজেই ঝড় হয়ে উঠলেন এবং দুয়ার বা বাধাকে ভেঙে ফেললেন শেষে এই রূপকের প্রয়োগ ঘটেছে। 'রক্তকরবী'র রাজা-কল্পনা রবীন্দ্রনাথের অন্ধকারের স্বামী-কল্পনা থেকে পরোক্ষ সাহায্য নিলেও যেহেতু এই রাজা মানবিক যন্ত্রণার বশীভূত তাই পরোক্ষ প্রভাবের সে ছায়াকে সে দূরে সরিয়ে দিয়েছে নিজের ঐশ্বরিক বিভূতিতে নয়, মানবিক প্রামাণিকতায়। গীতিকবিতায় বা গানে অন্ধকারের স্বামীর মধ্যে যেমন আকাশের অন্ধকারময় বিশুদ্ধতা, 'রক্তকরবী'র রাজা সেই বিশুদ্ধতায় বিমূর্ত থাকেন নি। অন্ধকারের স্বামী তিনি নন। তিনি সভ্যতার প্রতীক। রাজা আঘাত করেন, রাজা রুদ্র হয়ে ওঠেন, রাজা ভাঙেন, ধ্বংস করেন—এ কথা অন্ধকারের প্রভু, নাথ বা স্বামী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। 'রক্তকরবী'র রাজা রুদ্র হতে পারেন, ভাঙতে পারেন কিন্তু নিজেরই অন্তর্দ্বন্দ্বের রক্তকমলের ওপর তাঁর অধিষ্ঠান; সে রক্তকমলের মূল জীবন-মৃত্তিকাকে স্পর্শ করে রয়েছে।

১। হয়তো এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকৃত 'কুমারসম্ভব'-এর ব্যাখ্যার কথা আমাদের মনে হতে পারে এবং বস্তুত 'রাজা' নাটকে 'কুমারসম্ভব'-এর মর্মার্থের সূত্র স্পষ্টতই অনুভবগম্য।

এই রূপকার্যে প্রত্যক্ষ জীবন অনুসন্ধেয়। রাজার ক্লান্তিবোধেই তাঁর সত্য পরিচয়। সে বিষণ্ণ ক্লান্তির মূল ছিল নন্দিনীকে মিলিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করতে চাওয়ায়।

চার

'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যে দুটো প্রতীক্ষা প্রথমাবধি ক্রিয়াশীল। কুশীলবদের মধ্যে নন্দিনী একটা প্রতীক্ষা প্রবলভাবে সঞ্চারিত করেছে: "আজ রঞ্জন আসবে।" আর দর্শকমণ্ডলী আরেকটা প্রতীক্ষা করেছে এরই সঙ্গে, অন্ধকারের অন্তরালবর্তী রাজা বাইরে আসবে। দুটো প্রতীক্ষার দুই প্রতিক্রিয়া আশ্চর্য বন্ধনে সংবেশিত হয়েছে। রাজা অন্ধকারের আবরণ ভেঙে যখন আবির্ভূত হবেন তখন কী হবে তা আমরা কেউ জানি না। বরঞ্চ আশঙ্কিত উদ্বেগে এই ভেবে আমরা চঞ্চল যে বাঁধভাঙা বন্যাবারির ধ্বংসকে কী বেশে দেখব। এই অনির্দেশ্য ভবিতব্যতার কোলে একটি মাত্র মাধুর্যের আশ্বাস: রঞ্জন আসবে। প্রতীক্ষা 'ডাকঘর' এবং 'অচলায়তন'-এ মূল নাট্যরসের উৎস। 'ডাকঘর'-এ রাজার চিঠির জন্য অমলের প্রতীক্ষা নাট্যোৎসাহকে সজীব করে রেখেছে। আবার 'অচলায়তন'-এ গুরুর জন্য প্রতীক্ষা 'অচলায়তন'-এর নাট্যকৌতূহল রচনার মূলশক্তি। 'ডাকঘর'-এ অমলের রাজার চিঠির প্রতীক্ষার সঙ্গে সোনার সুতোর মতো জড়িয়ে রয়েছে সুধার প্রতিশ্রুতির জন্য অমলের প্রতীক্ষা। 'অচলায়তন'-এর গুরুর প্রতীক্ষার ভেতরে আর কোনো জটিলতা নেই। একটা পরম অনির্দেশ্যতার জন্য কবিমানসে প্রতীক্ষা রয়েছে, গানে কবিতায় একথাও রবীন্দ্রনাথের মুখে ইতিপূর্বে বহু উচ্চারিত। জীবনের ছকবাঁধা অভ্যাসিকতা-মন্থর যে আবহমণ্ডল, তার প্রতিক্রিয়াতেই প্রতীক্ষার জন্ম—আবার এই প্রতীক্ষার সাহায্যেই সেই অচল সময়ের অনুভূতিকে তীব্র করে তোলা হয়। কবে যে তিনি আসবেন তার দিনক্ষণ কেউ জানে না, তাই সদাই প্রতীক্ষা। দশকুমারীর কথিকার শেষে 'বাইবেল'-এর গল্পে বলা হয়েছে যে যারা যারা প্রস্তুত ছিল বরের দেখা সেই পাঁচজনই পেল। সকলে যখন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে ঢলে পড়েছে তখন সেই মধ্যরাত্রে হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল: "And at midnight there was a cry made, Behold the bridegroom cometh; ...and they that were ready went in

with him to the marriage." 'খেয়া'র আগমন কবিতায় প্রতীক্ষা ও অবিশ্বাসের পাশাপাশি দ্বন্দ্বময় মূর্তিটি প্রসঙ্গে 'বাইবেল'-এর এই কথিকাটির কথা মনে পড়ে।[১] মনে পড়ে অর্ধরাত্রে 'ডাকঘর'-এ রাজার আগমনের আশ্বাস, মাধব দত্তের অবিশ্বাস। বর এবং রাজার ভাবানুষঙ্গ এবং অর্ধেক রাত্রের ঘোষণার ভিতরে প্রভাব অনুসন্ধানের চলতি হাওয়ার পন্থী না হয়েও বলা চলে যে উভয় কবিই অন্ধতমসের কাছে বিকারহীন আত্ম-সমর্পণের মাঝখানে যে প্রতীক্ষাপরায়ণ, প্রস্তুতিশীল, তাকে পরম-প্রাপ্তির গৌরব দিয়েছেন। আজ রঞ্জন আসবে, জীবন বিচ্ছিন্ন যক্ষপুরীতে নন্দিনীর এই পরম প্রতীতির মধ্যেও সেই গৌরব নিহিত।

এই যে প্রতীক্ষা-প্রসঙ্গটি কবির গানে কবিতায় ও নাটকে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে 'রক্তকরবী'তে সেই প্রতীক্ষা একটা নতুন তাৎপর্য পেয়েছে। 'অচলায়তন'-এ 'ডাকঘর'-এ দেখা যায় এ প্রতীক্ষা ধন্য হলো কৃতার্থতায়। কিন্তু 'রক্তকরবী'তে রঞ্জন নাটকার্থে এসে পৌঁছল না—সে প্রাণ দিল। নন্দিনীর হাহাকার মথিত করল যক্ষপুরীর বদ্ধতাকে। এই সর্বব্যাপী হতাশার মাঝখানে রাজা তার আবরণ ভেঙে ফেললেন, ভেঙে ফেললেন ধ্বজদণ্ড, তিনি বাইরে এলেন। দর্শকরা রঞ্জনকে হারিয়ে রাজাকে পাচ্ছে। এবং এই হারানো আর পাওয়াকে তীব্রতা দিচ্ছে রাজার নিজেকে ভাঙাগড়া। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরাও নিজেদের মনোরাজ্যের ছকগুলোকে ভাঙে গড়ে বলে এর নাটকীয় আবেদন অভিনব।

পাঁচ

'রক্তকরবী'র আলোচনাকালে জনৈক পূর্ববর্তী সমালোচক কিশোরের প্রসঙ্গে 'শ্যামা'র উত্তীয়ের কথা বলেছেন। শুধু উত্তীয় নয়, এ প্রসঙ্গে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের অমূল্যের কথাও স্মরণীয়। উত্তীয়, অমূল্য এবং কিশোর আত্মবুদ্ধিহীন ভালোবাসার তিনটি স্তম্ভ। এদের তিনজনের ক্ষেত্রে প্রথম

১। সেও আর এক সুন্দরী নিঃশঙ্কিনী তরুণী। তিনিও আর এক মহাপ্রতাপের অধীশ্বর সম্রাট। সম্রাটের সমস্ত প্রতাপকে উপেক্ষা করে সে-তরুণী যে-সাহসে অধিকতর সুন্দর হয়ে উঠেছিল তাতে সম্রাটও হয়েছিলেন বিস্মিত। এই বিস্ময় ধীরে ধীরে বিষণ্ণ করে তুলল সম্রাটকে। তাঁর মনে হলো তিনি নিঃসঙ্গ। তরুণী, নির্মলকুমারী; সম্রাট, ঔরঙ্গজেব। বইটি 'রাজসিংহ'। বঙ্কিমের লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম উপন্যাস।

ভালোবাসার অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। আর এই প্রথম ভালোবাসার করুণ রঙীন পথ ধরে তিনজনেই পৌঁছে গেছে আত্মবিসর্জনের অনির্বাণ বিলুপ্তিতে। কিশোরপ্রেম বলেই এরা কখনো উক্তিতে এবং ব্যক্ততায় প্রগল্ভ হতে জানে না। আবার ন্যায় অন্যায় উচিত অনুচিতের বাঁধাধরা ছকেও এরা চিন্তা করতে অভ্যস্ত নয়। প্রেমের বেদনায় এরা অসমসাহসিক। মৃত্যুর বেদীমূলে সেই বেদনাকে এরা উৎসর্গ করে। নৃত্য-নাট্যের উত্তীয়ের মুখে এর ব্যাখ্যা আছে—"ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে"। এবং "গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক তবে অবসান"। এখানে মৃত্যুর ভেতরে একটা কিশোর-ভাবাতিরেক বিদ্যমান যা অন্যের হাতে মবিড বলে মনে হতে পারত। "কিন্তু গোপন ব্যথার নীরব রাত্রির অবসান"-বাসনাই উত্তীয়দের একমাত্র পরিচয় নয়। উত্তীয় এবং অমূল্য যে মৃত্যুবরণ করল সে মৃত্যু উভয়ক্ষেত্রেই নৈতিক আঘাত সঞ্চার করেছে। আঘাত সঞ্চার করব বলে তারা মরে নি। কিন্তু তাদের মৃত্যুতে দুই নারীর অন্যত্র উৎসর্জিত অসংযত কল্যাণ বিরহিত প্রেম একটা নৈতিক উপসংহারে পৌঁছেচে। শ্যামা এবং বিমলার শেষ বেদনার প্রধান ইন্ধন এরাই। কিন্তু কিশোর-প্রেম ও কিশোরের আত্মদানের প্রসঙ্গ 'রক্তকরবী'তে ব্যবহৃত হলেও তার তাৎপর্য অন্যতর। এখানে নন্দিনীর সৌন্দর্যটা কিশোরের কাছে শুধু আকর্ষণ নয়, প্রেরণা। সে সৌন্দর্য যক্ষপুরীতে সত্যের আঘাত হেনেছে বলে সে প্রেরণাও সত্যাদর্শমূলক। এলাকে দেখলে মনে হয় অগ্নিযুগের বাংলাদেশে এমন প্রেরণাদায়িনী মেয়ে ছিল যার নিদেশে দলের তরুণ সদস্য অক্লেশে দেশপ্রেমের বেদীতে মাথা দিতে পারত। যেমন পারতে চেয়েছিল অমূল্য। কিশোর কতকটা সেই ছকের মধ্যে পড়ে। কিশোরের দুঃসাহসিক অভিযানের প্রমাণ নাটকের প্রারম্ভে আমরা একবার মাত্র পেলাম। বিশুর জন্য তার আত্মোৎসর্গের সাহস ছিল তা-ও একবার দেখলাম। নাটকের শেষের দিকে খবর পেলাম তার গৌরবময় আত্মঘোষণাহীন মৃত্যুর। বাকি সময়টা কিশোর কী করছিল না করছিল তার কোনো খবরই আমরা রাখি না। দুর্ভেদ্য অন্তরালে সুরক্ষিত রাজাকে বিদ্রোহভরে আহ্বান করে মৃত্যুবরণের আকস্মিকতায় অগ্নিযুগের অনেক চেনা মৃত্যুর ছায়া খুঁজে পাওয়া যাবে। অথচ উত্তীয় এবং অমূল্যের ভেতরে যে অসম্পূর্ণতা রয়েছে তাদের প্রেম বা ভালোবাসার পাত্রীর নৈতিক

অসম্পূর্ণতার জন্য—কিশোরের ক্ষেত্রে সে অসম্পূর্ণতা নেই নন্দিনীর নিজস্ব ভূমিকাগত মাহাত্ম্যের জন্যই।

ছয়

রবীন্দ্রনাথ একটা অনড় অচলের প্রচণ্ড ভাঙনকে নাট্যকাহিনীর শেষে স্থাপন করেছেন 'অচলায়তন'-এ 'মুক্তধারা'য় এবং 'রক্তকরবী'তে। বিংশশতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে লেখা এই নাটকত্রয়ে ধ্বংসগত উপসংহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যা প্রাণস্রোতের হন্তারক তাকে ধ্বংস ব্যতীত মুক্তি নেই—এখানে রবীন্দ্রচিন্তায় কোনো দ্বিরাচরণ নেই। এবং চিন্তার এই স্পষ্টতার জন্য তাঁকে ইওরোপীয় হতে হয় নি—ভারতীয়তার সত্যার্থ উপলব্ধির ভিতর দিয়েই ধ্বংস যে গুণগত পরিবর্তন আনে তাকে তিনি জেনেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় আর তৃতীয় দশকের ভারতবর্ষের বাস্তবপরিস্থিতি নিঃসন্দেহে এই উপলব্ধির প্রাথমিক ভিত্তিভূমি রচনা করেছে।

কিন্তু 'রক্তকরবী'র রাজা যে পরিশেষে জাল ছিঁড়ে ফেললেন, ধ্বজদণ্ডকে ভেঙে ফেললেন, তার তাৎপর্য গভীরতর। এবং সেই তাৎপর্য বিদ্যমান বলেই 'রক্তকরবী'তে কবিজীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ একত্রিত হয়ে একটি ঐক্যসূত্রের বশবর্তী হয়েছে, প্রাপ্ত হয়েছে একটা শিল্পময় অখণ্ডতা। সেই তাৎপর্য রাজার মধ্যেই অনুসন্ধেয়। সে ক্ষেত্রে 'রক্তকরবী'র নাট্যরস কোন নৈতিক সচেতনতার আধারে স্থাপিত সেটাই প্রথম প্রশ্ন। আমরা আগে বলেছি যে রাজা সভ্যতার প্রতীক। সভ্যতার অন্তর্নিহিত সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা দীর্ঘকালের। আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞায় সভ্যতার সেই সমস্যার রূপটি তাঁর মনের মধ্যে আরো স্পষ্ট হয়েছে। পৃথিবীর নানা সভ্যতার অন্তর্গত সমস্যা একটাই, শক্তিকে কেমন করে শ্রীতে রূপান্তরিত করব, কেমন করে যা বিশেষের হাতে অধিগত হলো তাকে সার্বজনীন করে তুলব। যা অধিগত তা হোক আত্মস্থ। সমস্ত সভ্যতা গড়েছে এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে—ভেঙেছে এই উদ্দেশ্যের ব্যর্থতায়। এবং সভ্যতার এই অমীমাংসা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের চেহারা আরো বেশি প্রকট হয়েছে এ যুগের ধনবাদী সমাজে। সেখানে মানুষের প্রচণ্ড শক্তিমত্তার নিদর্শনও যেমন স্তূপীকৃত, তার ব্যর্থতার প্রমাণগুলোও তেমনি চারিদিকে পরিকীর্ণ। এই অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত শূন্যতাই ধীরে ধীরে সভ্যতাকে গ্রাস

করছে। বড় বড় সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি বা "পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন"—এ সমস্তই সভ্যতার সেই মর্মগত পীড়াকে অনুধাবন। 'রক্তকরবী'র রাজা এই সভ্যতার প্রতীক। তার যেমন প্রচণ্ড শক্তি তেমনি প্রবল ক্লান্তি। পাঠক দর্শকের কাছে 'রক্তকরবী'র রাজার ক্লান্তিটাই বারে বারে প্রধান হয়ে বেজেছে। এই ক্লান্তির মধ্যেই শক্তির বিকার। এই ক্লান্তি থেকে উত্তরণের মধ্যেই শক্তির মুক্তি। রাজার অন্ধকার-আধারে সভ্যতার এই মর্মগত সমস্যাকে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রণার রূপ দিয়েছেন।

সভ্যতার ইতিহাসের আধুনিক অধ্যায়ে ব্যক্তি, ব্যক্তিমর্যাদাকে আবিষ্কার করেছে। অথচ মিকেল এ্যাঞ্জেলোর আদমের মতোই সংস্কারমুক্ত, অবিচলতার পটভূমিতে স্থাপিত এবং দূর লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেও সে কিন্তু নিঃসঙ্গই। মানুষের এই ব্যক্তিতন্ত্রতা নিজেকে ঘিরে ঘিরে যত বেড়েছে তত সে জয়লাভ করেছে বাইরের দিক থেকে, কিন্তু গত শতাব্দী থেকে অস্তিত্বের যে খণ্ডায়ন বিপুলভাবে অনুভূত হয়েছে তার বীজও ছিল সেই জয়লাভের মধ্যে। তাই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ইওরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফলস্বরূপ অস্তিত্বের খণ্ডায়নের বিকল্পে ভারতবর্ষের নিজস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সাধনার সন্ধান করেছেন ; সে সাধনার মূল লক্ষ্য : "জীবনের সমস্ত খণ্ডতা ঘুচিয়ে দেওয়া", "বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গে অবিরোধে মিলিত হওয়া"। রাজার শেষ মুক্তি তাকে সেই দিকেই নিয়ে গেল। সভ্যতার বিন্যাসে যে ত্রুটি রয়েছে তার ফলস্বরূপ খণ্ডতার আতিশয্য থেকে রেহাই নিয়ে সমগ্র জীবনের দিকে এই যাত্রা। কুবেরের শ্রীহীন সঞ্চয় থেকে বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভের দিকে সেই যাত্রার আহ্বান 'রক্তকরবী'তে বারে বারে বেজেছে। সভ্যতা নিজের অসম্পূর্ণতাকে, অচরিতার্থতাকে অতিক্রম করবে বলে তার শক্তির শেষ সংগ্রাম তাকেই ভেঙে গড়বে নতুন করে।

'রক্তকরবী'তে রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের প্রিয়প্রসঙ্গগুলির একত্র সমাবেশ এই সভ্যতার সমস্যাসংক্রান্ত সচেতনতার জন্য রসগত অখণ্ডতা লাভ করেছে। জগৎ-বিচ্ছিন্ন অন্ধকারেরর রাজা নিজের শক্তিতে নিজে বিকারগ্রস্ত, কিশোরের প্রাণময় বিদ্রোহ এই শক্তির বিকারের বিরুদ্ধে—প্রকৃতপক্ষে সমস্ত প্রতীক্ষাই ছিল বিদ্রোহের প্রতীক্ষা, কিশোরে এই বিদ্রোহের শুরু, রাজার নিজের বিদ্রোহে তার পরিণতি, সেই প্রতীক্ষারই উপসংহারে আমরা

পেয়েছি অবিচল অনড়তার পতন। এইভাবে 'রক্তকরবী' বর্তমান সভ্যতার আলেখ্য হয়ে উঠেছে।

সাত

'রক্তকরবী'র গল্পস্রোতকে টেনে নিয়ে গেছে রাজা। নন্দিনীকে অনেকটা বুঝতে হয় অপরের ওপর নন্দিনীর প্রতিক্রিয়া দেখে। এবং সে প্রতিক্রিয়াগুলি স্বরূপত এক বলে নন্দিনীকে অনেকটা পূর্বস্বীকৃত বলে মনে হয়। তথাপি 'রক্তকরবী' নাটকের কুশীলবেরা নন্দিনী 'বাইগ্রস্ত' নয়। গোকুল এবং চন্দ্রার মধ্যে নন্দিনীকে অবিশ্বাসের প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। অবশ্য নানা দিক থেকে নাটকের সব থেকে গভীর-রেখ চরিত্র বিশু পাগল। সভ্যতার যে ক্লান্তি 'রক্তকরবী' নাটকের বিষয় বিশু পাগলের গানে তার ব্যক্তিগত রূপালেখ্য। তার গানে এই ক্লান্তির সুর প্রধানত এসেছে নন্দিনীর সঙ্গে তার পূর্বসম্পর্কের জের ধরে—কিন্তু মূলত তা নন্দিনীকে অবলম্বন করে জীবনের অখণ্ডতা সম্বন্ধে বিরহবেদনার দ্যোতক। বিশু পাগলের গানে সভ্যতার ব্যাধিবেদনাই যেন অনুরণিত ও স্পন্দিত। সে যেন সেই রোমান্টিক এ্যাগনির কবি—বর্তমান সভ্যতার কোলে যার জন্ম। লক্ষণীয় যে রাজাকে অবলম্বন করে নাটকের গতি যেখানে তীব্র সেখানে গান নেই। যেখানে নন্দিনী, সেখানে নাটকের গতি স্তিমিত, সেখানেই বিশু কথা বলেছে গানের পরিভাষায়। নাটকের সম্মুখগতি স্তিমিত, এই অবকাশে তাকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করা হয়েছে গভীরে। এবং এই গভীরতা বন্ধন হয়ে ওঠবার আগেই 'রক্তকরবী'র প্রকৃতিচেতনা তাকে আবার গতিময় করে তুলেছে। অন্ধকার ভূগর্ভে সময়ের স্রোত স্থগিত হয়ে যায় বলেই বস্তুপুঞ্জের অচল বিকার স্তূপীকৃত হয়। কিন্তু সময়ের স্রোতে স্থাপিত না করলে জীবনলগ্ন প্রকৃতিকেও স্বরূপে বোঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনায় এই বিবর্তন-সম্ভবময় সময়-স্রোতের উপলব্ধিতে রেনেসাঁসের প্রকৃতিতত্ত্বের পরবর্তী, আধুনিক প্রকৃতি-দ্রষ্টারই বিশিষ্টতা। তাই বারে বারে যক্ষপুরীর শীতবদ্ধতার মাঝখানে শোনা গেছে, বসন্তের ফুলের আহ্বান নয়, পৌষের জীবনধারার গান। নিষ্ঠুর মরণ ও প্রচণ্ড ভাঙন দুইই ব্যর্থ যদি সময়-স্রোতে স্থাপিত জগৎ-চেতনা সকল কিছুর পরিশেষে না থাকে।

মার্টিন অ্যানডারসেন নেক্সো

বেলা দত্তগুপ্ত

রূপকথার রাজা হানস ক্রিষ্টিয়ান অ্যানডারসেন বলেছিলেন "My life has been a wonderful fairy tale." অসাধারণ দারিদ্র্য, অপরিসীম লাঞ্ছনা ও জীবনের বহু ক্ষেত্রে নিদারুণ ব্যর্থতা সত্ত্বেও হান্স অ্যানডারসেন জীবনকে দেখেছিলেন রূপকথার অপরূপ মাধুর্যে সিক্ত করে, আর তাই না তাঁর Ugly Duckling পরিণতি পেল এক স্বয়ম্ভর, সুন্দর রাজহংসে। এ যেন তাঁর নিজের জীবনেরই ক্রমিক পরিণতির এক রূপময় ইতিহাস। হান্সের লেখা 'রাজার পোষাক' গল্পটি লেনিনের হৃদয় জয় করে। Socialist Realism-এর একটি নিখুঁত রূপায়ণ দেখতে পান লেনিন এই বিখ্যাত কৌতুকদীপ্ত গল্পটিতে। লেনিনের কাছে বিচিত্র পোষাকপরা রাজাটি আর কেউই নয় স্বয়ং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আর এই ধনতন্ত্রের নগ্ন রূপটি আঙুল দিয়ে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছে শিশু। এই শিশুটি সমাজতন্ত্র। লেনিনের মতে হান্সই সর্বপ্রথম সোস্যালিষ্ট রিয়ালিজমের স্বরূপ উপলব্ধি ও উদ্ঘাটন করতে পেরেছিলেন।

লেনিনের মতে মত মেলানো শক্ত আমাদের পক্ষে। হান্স ক্রিষ্টিয়ান অ্যানডারসেনকে প্রোলিটেরিয়েট সাহিত্যিক হিসেবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হইনি আমরা। আমাদের কাছে তিনি রূপকথার রাজা হয়ে রইবেন চিরদিন, তবে সে রূপকথা "too deep for tears"। 'ফারগাছ', 'লালজুতো', 'মা ও ছেলে', 'দেশলাই ফিরি করা মেয়ে' (Tinder Box) এমনি আরো অজস্র গল্প রূপকথার গণ্ডি পেরিয়ে সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের দুঃখ দুর্দশা, ব্যথা-বেদনার রূপকে উত্তীর্ণ হয়েছে।

লেনিনের আকাঙ্ক্ষিত প্রোলিটেরিয়েট সাহিত্যিক এলেন হান্সের পরের যুগে। মার্টিন অ্যানডারসেন নেক্সো (১৮৬৯—১৯৫৪)। হয়ত 'হ্যামলেট' নাটকে Marcellus-এর কথাই সত্য যে "Something is rotten in the state of Denmark।" নইলে এ লেখকের ভাগ্যও কেন এত বিড়ম্বিত হবে? হান্সের মতোই অপরিসীম দারিদ্র্যে, অযত্নে, অবহেলায় দিন কেটেছে নেক্সোর,

কিন্তু "অতৃপ্ত, অসুখী, অনমনীয়" এই যুবক স্বপ্ন দেখেছেন ভুবনের ভার গ্রহণ করার। তাঁর Pelle (Pelle, the conqueror) গেয়ে ওঠে "আমার যৌবন স্বপ্নে ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ"। তাঁর Ditte নেরুদার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলে "From death comes our rebirth", আর গ্রহণ করে মৃত্যুকে জীবন অক্ষয় জেনে। Pelle ও Ditte-র জনক তখন চেয়ে বসে থাকেন Toward Dawn যেখানে

"প্রত্যহের ইন্দ্রধনু ভেঙ্গে যাক স্তরে স্তরে
বাঁচার বিস্ময়ে ছড়াক রঙের ঝর্ণা
সহাস জীবনে এনে দিক
সহজ আনন্দ দিক মানবিক দুঃখের করুণা।"

গণসাহিত্যিক হিসেবে নেক্সোর খ্যাতি আজ পৃথিবীজোড়া। রুশদেশে ম্যাকসিম গর্কী, চীনদেশের লু স্যুন-এর পরেই ডেনমার্কের মার্টিন অ্যানডারসেন নেক্সোকে স্মরণ করা হয় জনগণের সাহিত্যিক বলে।

১৮৬৯ সনের ২৬শে জুন কোপেনহাগেন শহরের এক বস্তিতে নেক্সোর জন্ম। কয়েক বছর কোপেনহাগেনে কাটিয়ে নেক্সোর বাবা মা সেখানকার বাস তুলে দিতে বাধ্য হন। বোর্নহোম দ্বীপে ছোট্ট একটি কুঁড়ে ও কিছু সজ্জন প্রতিবেশী ছিল এঁদের। এখানেই ফিরলেন নেক্সোর বাবা মা কিশোর পুত্রকে নিয়ে। জেলের ছেলে, তায় অর্থাভাব, লেখাপড়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না নেক্সোর। বরং বাবা মা-র মনে হয় কোনো একটা কাজে লেগে গেলেই পারে ছেলেটা। গরু ভেড়ার রাখালী করাই বা মন্দ কি? এতেই প্রথম শিক্ষানবিশী নেক্সোর। তারপর মুচির দোকানে। কিন্তু অভাবের তুলনায় অর্থের আমদানিটা মোটেই যথেষ্ট নয়। এর চেয়ে রাজ-মিস্ত্রির ইট বওয়ার কাজটা অনেক ভালো, বেশ মজুরীও পাওয়া যায়। সুতরাং মুচির কাজ ছেড়ে রাজমিস্ত্রির মজুরের কাজ নিলেন নেক্সো। কাজ করেন আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভাবেন রাজমিস্ত্রিদের কথা লিখলে কেমন হয় গল্পের ভিতর দিয়ে? কেমন হয় বল্টিক ও উত্তর সাগরে প্রকৃতির সব প্রতিরোধ উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়া জেলেদের জীবন কাহিনী লিখলে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় কেমন করে লিখবেন—লেখাপড়া তো শেখেন নি, যান নি তো স্কুলে। এই "অতৃপ্ত, অসুখী, অনমনীয়" ছেলেটিকে কিন্তু চিনতে পেরেছিল তার বন্ধুবান্ধব। তারা জোর করে নেক্সোকে Ascov Folk

High School-এ পাঠায়। নেক্সোর জীবনে "নূতন উষার স্বর্ণদুয়ার" খুলে গেল। কয়েক বছর Ascov Folk School-এ পড়াশুনা করে রুচি ও বুদ্ধির একটি সংযত বিকাশ হলো নেক্সোর। বোর্নহোমের কপিল-গুহা থেকে বেরিয়ে এসে বহির্বিশ্বকে দেখবার, জানবার সুযোগ পেলেন তিনি। আত্মবিকাশের পথটিও সহজ হয়ে উঠল। এতদিন যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন জীবনের মহাকাব্য থেকে আজ তা রূপ নিতে শুরু করল গল্পে, উপন্যাসে।

তিরিশ বছর বয়সে তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর প্রথম বই 'Shadows': ছোট গল্পের সংকলন। বাল্যে ও যৌবনে যে সব জায়গায় কাটিয়েছেন, যাদের সঙ্গে মিলেছেন মিশেছেন সেই সব মুচি, মজুর, জেলে, কুলিকামিনদের নিয়ে লেখা এই বই। *Shadows*-এর সমাদর হয় অনায়াসে এবং অচিরেই। এ বই বেরোবার পর ডেনমার্কের নামহীন, গোত্রহীন মজুর সমাজ উল্লসিত অভিনন্দন জানায় নেক্সোকে এবং "they took him to be their mouthpiece". ইওরোপের বহুদেশ তিনি ঘুরেছেন এবং বিভিন্ন জায়গার শ্রমিকসংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে সুসংবদ্ধ চেতনা ও রাজনৈতিক বোধ জাগ্রত করাই ছিল, তাঁর মতে, আপন অবিচলিত লক্ষ্য। ১৯২০ সনে নেক্সো প্রথমবার সোভিয়েত রাশিয়ায় যান। সেখানকার 'New Civilisation' দেখে তিনি মুগ্ধ হন। ডেনমার্কে ফিরে এসে কর্মের এক সুবৃহৎ ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নেক্সো।

১৯২০-২৩ সনে 'Pelle, the Conqueror'-এর (হাইনমান কোম্পানীর প্রকাশনায় লণ্ডন থেকে) প্রথম ইংরেজী অনুবাদ বেরোয়। 'Pelle, the Conqueror'-কে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলা যেতে পারে। তাঁর Pelle তাঁরই মতো "springs naked out of nothing and conquers the world." ডেনমার্ক ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অনতিআধুনিক সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সাহিত্যে বিদ্রোহ থাকা সত্ত্বেও গল্প উপন্যাসের চৌহদ্দি অভিজাত, অভিজাতকল্প কিংবা মধ্যবিত্তসমাজে বিধৃত ছিল। জোহান বোয়ার, ন্যুট হামসুনের মতো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ব্যতীত সেলমা লাগেরলফ (Selma Lagerlof), সিগ্রীড উণ্ডসেট (Sigrid Undset), হেনরিক ইবসেন (Henrik Ibsen) প্রমুখ লেখক-লেখিকাদের উপন্যাসের setting উচ্চ অথবা মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনকে কেন্দ্র করে।

ডেনমার্কে যাঁরা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন (K. Gejellerup, H. Pontoppidan, J. V. Jensen) তাঁদের লেখার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও অনুবাদ ও অন্যান্য মাধ্যমে তাঁদের রচিত সাহিত্যের যে আংশিক আভাষ আমরা পাই তাতে H. Pontoppidan ব্যতীত অন্য কাউকে জনগণের সাহিত্যিক বলা যায় না। নেক্সোর অনন্যতা এখানেই যে তাঁর নায়কনায়িকাদের কারোই জন্মের, অর্থের, বিদ্যার আভিজাত্য বা কৌলিন্য নেই অথচ "Nothing human is alien to them". Pelle-এর বিশ্বজয়ী ও Ditte-র তাপসী মূর্তিটি এই অসাধারণ মানবতাবোধ দিয়ে সৃষ্টি। কী অপরিসীম দরদই না ফুটে উঠেছে নেক্সোর এই অনবদ্য মানববন্দনায়:

"Every second a human soul is born into the world—that which never been becomes flesh and blood. No human being is a repetition of any that has gone before or will ever be repented in future. Every new being is like a comet which only once in all eternity touches the earth's orbit—a phosphorescence between two eternities of darkness. Then no doubt there is joy among men at every newly lit soul."

এই আশ্চর্য কথাগুলো কি মায়াকভস্কির বিখ্যাত

"To abhor all kinds of deathliness
To adore all kinds of life."

চরণ দুটিকে স্মরণ করিয়ে দেয় না?

এই অসাধারণ জীবনসংবেদ্যতা ছিল বলেই দারিদ্র্যের নির্মমতম কশাঘাতে, জীবনের অযুত ভাগ্যবিপর্যয়ে নেক্সো নিজে জীবনবিমুখ হন নি কিংবা তাঁর মানসপুত্র, মানসকন্যাকে জীবনপরাঙ্মুখ করেন নি। "To live life, to know it and yet to love it" এই ছিল এই আশ্চর্য মানবতাবাদী সাহিত্যিকের জীবনদর্শন।

১৯৪০-৪৫ এই ক-টি বছর ডেনমার্কের পক্ষে দারুণ দুর্দৈবের। ডেনমার্ক তখন জার্মান অধিকৃত, অবরুদ্ধ। নেক্সোর ওপর নাৎসী জার্মানদের খরদৃষ্টি। রেহাই পেলেন না নেক্সো ঈগলচক্ষু থেকে। যেতে হলো কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে গ্যাস চেম্বারে কিংবা অন্য বীভৎসতায়

তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়নি। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে কি করে যেন পালাবার সুযোগ এসে গেল। ডেনমার্ক থেকে পালিয়ে সুইডেনের ভিতর দিয়ে অতিকষ্টে রাশিয়ায় এসে পৌছন দীর্ঘদিন পরে। যুদ্ধান্তে তিনি আবার ডেনমার্কে ফিরে আসেন। '*Toward Dawn*' সোভিয়েত দেশ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার ও অভিমতের একটি প্রামাণ্য দলিল।

নেক্সোর নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তিনি বিবাহিত না অকৃতদার ছিলেন সে সম্বন্ধেও কোনো আলোকপাত করা সম্ভব নয়। যতদিন না তাঁর চার খণ্ড আত্মজীবনী ডেনিশ ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনূদিত হচ্ছে ততদিন আমাদের এই লেখকের জীবন সম্বন্ধে বিশদ সংবাদ পাওয়া অসম্ভব।

১৯৫৪ সনে এই বিখ্যাত সাহিত্যিকের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি 'Toward Dawn' তাকিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রতিটি মানুষ যেন জীবনে জীবন যোগ করে, বেঁচে থেকে, একলব্য সাধনায় বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় সুখী সুন্দর সমাজ গড়ে তোলে। হান্স ও নেক্সোর মাঝখানে প্রায় দুইটি প্রজন্মের ব্যবধান অথচ জীবনময়তার নিবাত, নিষ্কম্প শিখাটি কী আশ্চর্য জ্বালিয়ে রেখেছিলেন হান্সের এই উত্তরসাধক।

নেক্সোর লেখা বই :

১ The Shadows
২ Pelle, the Conqueror
 (i) Boyhood
 (ii) Apprenticeship
 (iii) The Great Struggle
 (iv) Daybreak
৩ Ditte
 (i) Ditte, Daughter of man.
 (ii) Girl Alive !
 (iii) Towards the Stars.
৪ Toward Dawn
৫ Autobiography of Nexo (4 vols.)
৬ Collection of Short Stories

বজ্রমণি

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাথরের নিচে হৃৎপিণ্ডগুলি
যেন নীলকান্ত মণির
মধ্যখানের মায়াবী রক্তবিন্দু।

তারা পাশাবতীর সঙ্গে খেলতে খেলতে
তার মুখ স্তন পায়ের পাতা
কিছুই দেখে নি।

তাদের সকল লাবণ্য আজ ফোঁটাফোঁটা
তৃষ্ণার রক্ত হয়ে
মাটির সেই গভীরে তলিয়ে গেছে
যেখানে হীরা ছাড়া আর কোনো অভিগমন নেই ;
যেখানে প্রেম ক্ষয় হ'তে হ'তে এক অবিনশ্বর কঠিনতা।

জন্মদিন

রণজিৎ সিংহ

এসো সকালবেলার হাওয়া। পাখির ডাক। মাঠের পর মাঠের স্রোত। এসো পুরনো বসতির ভুলে যাওয়া গল্প—গনগনে দুপুরে ঘুরে ফেরা, একলা জাগার রাত, ফুল কুড়নোর ভোর, মেলা থেকে ঘরে ফেরা, সমুদ্রপারের অস্থিরতা…একবার এসো। আবার ভুলে যাব।

পায়ে পায়ে এসেছি কতদুর। কেমন আলিঙ্গনের উত্তাল উল্লাসক্ষণে শিহরণে শিহরণে গড়ে উঠেছিলাম। ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম মাটির উষ্ণ শুশ্রূষায়। শূন্যে হাওয়ার দুন্দুভি বেজেছিল।

আর সে দিয়েছে দুরধিগম্য দুর্গ জয়ের জ্বালা।

একবার এসো ও ছেলেবেলা ও বয়ঃসন্ধি। সকালবেলার হাওয়া ফিরছে, পাখি ডাকছে, মাঠের স্রোত চোখে ভাসছে। একবার মুখোমুখি এসো, আবার ভুলে যাব। যাব দূরের দেশে অন্য বাসভূমে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান এবং বাঁট

হীরেন চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচেতনার পশ্চাদ্‌ভূমিরূপে ধ্রুপদের ভূমিকা নূতন উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথের জবানিতেই যদি এর সম্যক স্বীকৃতি না থাকত তাহলেও একে প্রমাণ করা কিছুমাত্র কষ্টকর হতো না। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বাণী-রচনার ক্ষেত্রে ধ্রুপদের চার-তুকী স্থাপত্যকে কদাচিৎ অস্বীকার করা হয়েছে। স্বরারোপেও ধ্রুপদী চালকে সাধারণত মেনে নেওয়া হয়েছে অন্তরা এবং আভোগের সমন্বয়ে। খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী ইত্যাদি চালের গানও অবশ্য অল্পসংখ্যক নয় তথাপি সাঙ্গীতিক চেতনার এই পশ্চাদ্‌ভূমি অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করা না হয় যে, বাংলাদেশের নিজস্ব-রীতির কীর্তন এবং লোকসঙ্গীতও সেই ভূমির কম জায়গা জুড়ে নেই। ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীতের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পরিচয় নিতান্ত আবশ্যক। তাতে দুর্বল রসমুগ্ধতা থেকে আমাদের পরিত্রাণ করবে। এ কিন্তু অনুশীলনের জন্য, অনুকরণের জন্য নয়। আর্টে যা শ্রেষ্ঠ তা অনুকরণজাত নয়। সেই সৃষ্টি আর্টিস্টের সংস্কৃতিবান মনের স্বকীয় প্রেরণা হতে উদ্ভূত।" ['সুর ও সঙ্গতি', পৃঃ ৯৩]। ধ্রুপদী সঙ্গীত থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন তার পরিমিতিবোধ এবং সুসঙ্গতি। ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীত বিশেষত ধ্রুপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাঙ্গীতিক প্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন সত্য কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বহুবিস্তৃত আলাপ, বিস্তার এবং জটিল অলঙ্করণকে তিনি তাঁর সাঙ্গীতিক প্রকল্প থেকে বর্জন করেছিলেন। এই বর্জিত অলঙ্করণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে খেয়ালী তান, ধ্রুপদী লয়-বাঁটোয়ারা এবং টপ্পার জমজমা। এই প্রসঙ্গে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে স্বর্গত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তিনি লিখছেন: "অতি বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানী সুরে আমার কান এবং প্রাণ ভর্তি হয়েছে, যেমন হয়েছে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ভাবে ও রসে।

কিন্তু অনুকরণ করলেই নৌকাডুবি; নিজের টিকি পর্যন্ত দেখা যাবে না। **হিন্দুস্থানী সুর ভুলতে ভুলতে তবে গান রচনা করেছি।**" বড় অক্ষরের কথাগুলো সর্বদা স্মরণীয় নতুবা রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক প্রত্যয় সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ঘটার সম্ভাবনা সমধিক। তাঁর মতে: "আমাদের গানেও **হিন্দুস্থানী যতই বাঙালী** হয়ে উঠবে ততই মঙ্গল, অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে।" রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দুস্থানী আঙ্গিক এবং বাংলাকাব্যের মেজাজ এক সুষ্ঠু এবং সুপরিণত সংশ্লেষে সমন্বিত হয়েছে বলেই তা আমাদের কাছে এমন মনোহরণ রূপে দেখা দিয়েছে।

অতঃপর দুটো সিদ্ধান্ত অনিবার্য—প্রথমত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিশেষত ধ্রুপদের ভক্ত হয়েও রবীন্দ্রনাথ যে নতুন সঙ্গীত রচনা করলেন তা পুরোপুরি কেন আদৌ হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ, খেয়াল অথবা টপ্পার বাংলা নিদর্শন নয়; হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুরের কাঠামোটুকু ছাড়া বাকি সব অঙ্গই তিনি বর্জন করেছেন। তাঁর কথা থেকে আরো একটি খবর জানা যাচ্ছে যে, হিন্দুস্থানী আস্থায়ী ভেঙ্গে তিনি যে সব ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালাঙ্গ অথবা টপ্পা-অঙ্গের গান রচনা করেছেন তাতে মূল গানের আলাপ, বিস্তার এবং অলঙ্কার অর্থাৎ তান ইত্যাদি যথাসম্ভব বর্জন করে সেগুলিকে পুরোপুরি বাংলা কাব্যসঙ্গীতে রূপান্তরিত করেছেন। বাংলাগানের এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "বাংলাদেশে সঙ্গীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ।"

দ্বিতীয়ত ধ্রুপদের বিলম্বিত এবং বিস্তৃত আলাপপদ্ধতিকে বর্জন করে তিনি গ্রহণ করলেন তার সুরের এবং বস্তুর স্থাপত্য যার সাঙ্গীতিক নাম হলো স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ। সুরের স্থাপত্যেও ধ্রুপদকে অনুসরণ করলেন বটে কিন্তু অন্ধভাবে নয়—রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঞ্চারী এক নতুন সৃষ্টি, তা প্রায়শ স্থায়ী সুরের পুনরাবৃত্তি নয়। মূল গানের সঙ্গে ভাঙ্গা গানের তুলনামূলক বিচার করলেই দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথের সমুদয় ভাঙ্গা গান একজন বাঙালী কবির পরিশীলিত রুচি ও সচেতন সৌন্দর্যানুভূতির দ্বারা আচ্ছন্ন, মূল হিন্দুস্থানী গানের সঙ্গে তার রক্তের সম্বন্ধ হয়তো থাকতেও পারে কিন্তু নাড়ির টান নেই।

হিন্দুস্থানী ধ্রুপদী গানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, রাগের আলাপই হলো ধ্রুপদের অবশ্যকর্তব্য অঙ্গ; ধ্রুপদী যন্ত্রসঙ্গীত সম্বন্ধেও

একই কথা। আলাপের পরে ধ্রুপদে আর বিশেষ কিছু বাকি থাকে না; চার-তুকের কাব্যাংশটি হলো এক প্রকারের কন্‌সোলেশন প্রাইজ যার অভিপ্রেত প্রাপক হলেন স্বল্পশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী। খেয়ালী রীতিতেও আলাপ (অধুনা বিস্তার) এবং তানাদি অলঙ্কার অবশ্যকরণীয়। টপ্পার ক্ষেত্রে বোলতান এবং জমজমা তান্‌; ঠুংরীর ক্ষেত্রে 'ভাও বাতলানো'—এগুলি নির্দিষ্ট রীতির অপরিহার্য অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে এইগুলিকে বর্জন করেছেন। টপ্পা-অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীতে সামান্য অলঙ্কার দেখা যায় যেগুলিকে আমরা সাধারণত গিট্‌কিরি বলে থাকি; এগুলিকে তান না বলাই সঙ্গত। অতঃপর একথা বোধহয় কোনো প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলা চলে যে, তথাকথিত পুরোপুরি ধ্রুপদ অথবা খেয়াল অথবা টপ্পা অথবা ঠুংরী অথবা কীর্তন গান রবীন্দ্রনাথ একটিও রচনা করেন নি। নতুন একজন বৈজু বাওরা অথবা সদারঙ্গ হওয়ার বাসনা তাঁর মনে স্থান পায় নি। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন: "আমি পথ জানি না বলিয়াই হোক কিম্বা আমার মনটা লক্ষ্মীছাড়া স্বভাবের বলিয়াই হোক এতদিন গানের ঐ অপথ এবং আঘাটা দিয়াই চলিয়াছি। সুতরাং আমার অভিজ্ঞতায় যাহা মিলিয়াছে তাহা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না" ['সঙ্গীতের মুক্তি']। রাগসঙ্গীতের অলঙ্কার অর্থাৎ আলাপ, বিস্তার, তান, বাঁট ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য: "মহাদেব, নারদ এবং ভরত মুনিতে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া যদি আমাদের সঙ্গীতকে এমন চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়া থাকেন যে আমরা তাকে কেবলমাত্র মানিতেই পারি সৃষ্টি করিতে না পারি তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে।" ['সঙ্গীতের মুক্তি']।

ধ্রুপদী নির্মিতির প্রভাব শুধু যে, হিন্দুস্থানী ভাঙ্গা গানের বেলায়ই এসেছে তা নয়, আইরিশ এবং স্কচ মেলডি ভেঙ্গে যে গান বেঁধেছেন সেখানেও দেখতে পাই ধ্রুপদী চার-তুকের বাঁধন। বস্তুত ধ্রুপদী-গাম্ভীর্য এবং সংযমের প্রতি তিনি যে পক্ষপাত প্রদর্শন করেছেন, ক্লাসিকাল সঙ্গীতের অন্যতম স্তম্ভ খেয়ালের ভাগ্যে তার ছিঁটেফোটাও যে জুটল না এ ঘটনা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। অথচ উনবিংশ শতাব্দীকেই বলা যায় খেয়ালী-রীতির স্বর্ণযুগ। স্পষ্টই বোঝা যায় খেয়াল এবং ঠুংরী রবীন্দ্রনাথকে তেমন রস জোগাতে পারে নি এবং সেই কারণেই বোধহয়

এই দুই রীতির প্রভাব রবীন্দ্রসঙ্গীতে খুব সামান্য। তুলনায় বরং টপ্পা এবং কীর্তনের প্রভাব বেশি। এর পরে বুঝতে কষ্ট হয় না কেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে জটিল তান এবং অনাবশ্যক অলঙ্করণের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেছিলেন। খেয়াল ঢঙের রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তানের নামগন্ধও নেই যেমন দরবারী কানাড়ার আশ্রয়ে ত্রিতালের ছন্দে বাঁধা "এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে" গানখানি। আশ্চর্য! এই গানে তানের সামান্য একটা গিটকিরি পর্যন্ত নেই। অথচ কীর্তনের আখরে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর কোনো কোনো গানে তার যোজনাও করেছিলেন। আখরকে তিনি নিজেই বলেছেন "কথার বিস্তার"। এই কথার বিস্তার প্রচুর যোজনা করেছিলেন "আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ" গানটিতে, কবির হস্তাক্ষরে যা মুদ্রিত হয়েছে।

বাংলা গানের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মিশ্র সঙ্গীতের পক্ষপাতী, শুদ্ধ সঙ্গীতের নয়। সুরের বেশে বাণীর নব নব রূপধারণই তাঁকে আকৃষ্ট করত বেশি। কাব্যব্যঞ্জনা এবং সুরব্যঞ্জনার সম্মিলিত রূপই ছিল তাঁর আরাধ্য। বলা যায় সাঙ্গীতিক রসের বিচারে তিনি ছিলেন মিশ্র রসের রসিক। সুতরাং শুদ্ধ সঙ্গীত যেখানে একান্তভাবে ধ্বনিনির্ভর এবং শুধুমাত্র রাগরূপায়ণে মগ্ন থেকে কাব্যাংশকে নিছক একটা উপলক্ষে পরিণত করে, তার বিপরীত দৃষ্টান্ত হিসাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত তার কাব্যার্থকে পরিস্ফুট করবার জন্য সঙ্গীতের ব্যাকরণকে দরকার হলেই লঙ্ঘন করে থাকে। যেমন "ফুল বলে ধন্য আমি" গানখানি ইমন রাগের উপরে। কিন্তু যেইমাত্র "দেবতা ওগো" কথাটা এলো অমনি দেখা গেলো ইমনী ঋষভের এমন ক্ষমতা নেই যে, ঐ কাকুতিকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। সুতরাং আমরা পেলাম শুদ্ধ ঋষভের জায়গায় কোমল ঋষভ। কিন্তু এটা যদি তথাকথিত ধ্রুপদ অথবা খেয়াল হতো তাহলে সে বলত "চুলোয় যাক তোমার কাকুতিমিনতি, তার জন্য আমার শুদ্ধ ঋষভকে অশুদ্ধ করতে পারব না।" অনুরূপ পরিবর্তন হয়েছে "এবার নীরব করে দাও" গানটিতে। এই গানের "বাজাও", "কেড়ে', "রাতে" ইত্যাদি কথাগুলিতে যে কোমল ধৈবতের পরিবর্তে শুদ্ধ ধৈবত লাগানো হয়েছে সেটা শুধু ব্যতিক্রমের খাতিরে নয়—কাব্যার্থকে গভীর করার জন্য। "রাতে" কথাটিতেও কোমল নিষাদের পরিবর্তে শুদ্ধ নিষাদের ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি যে ইচ্ছাকৃতভাবে এসেছে তাও হয়তো নয়,

কাব্যার্থের স্বাভাবিক আকর্ষণেই এদের আবির্ভাব। সঙ্গীত যেখানে একান্তভাবে স্বরনির্ভর যেমন ধ্রুপদ এবং খেয়াল, সেখানে ইমনে কোমল ঋষভ, অথবা দরবারী কানাড়ায় শুদ্ধ নিষাদ এবং ধৈবত শুধু যে ব্যতিক্রম তাই নয়, তার স্বরপরম্পরার সঙ্গেও অসঙ্গতিপূর্ণ। যেহেতু অসঙ্গতি বিকৃতির জননী সেইহেতু কোনো কিছুর বিকৃত রূপায়ণ প্রীতিকর না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কাব্যসঙ্গীতের ব্যাকরণ আলাদা। সেইজন্য এই সামান্য ভ্রষ্টতার জন্য ইমনের এবং দরবারী কানাড়ার হয়তো মান গিয়ে থাকতে পারে কিন্তু গানের ব্যঞ্জনা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বচনীয় থেকে অনির্বচনীয়ের পারে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাকরণ শাস্ত্রীয় ব্যাকরণের ঘানি টেনে চলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়: "হিন্দুস্থানী গানকে আচারের শিকলে যাঁরা অচল করে বেঁধেছেন সেই ডিক্‌টেটারদের আমি মানি নে। যাঁরা বলেন, ভারতীয় গানের বিরাট ভূমিকার উপরে, নব নব যুগের নব নব যে সৃষ্টি স্বপ্রকাশ, তার স্থান নেই; ঐখানে হাতকড়ি-পরা বন্দীদের পুনঃপুন আবর্তনের অনতিক্রমণীয় চক্রপথ আছে মাত্র এমনতর নিন্দোক্তি যাঁরা স্পর্ধাসহকারে ঘোষণা করে থাকেন তাঁদেরই প্রতিবাদ করবার জন্যই আমার মতো বিদ্রোহীদের জন্ম—সেই প্রতিবাদ ভিন্ন প্রণালীতে কীর্তনকাররাও করে গেছেন।" ['সুর ও সঙ্গতি', পৃঃ ৮]। বলাই বাহুল্য ইমন, দরবারী কানাড়া প্রভৃতি সম্পূর্ণ রাগের বেলায় বিবাদী স্বর ব্যবহারের যুক্তি অচল।

রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ থেকে যখন মুক্তি পাওয়া গেল তখন গানের সম্মুখে একটা নতুন পথ খুলে গেল। শুধু যে বিদেশী গানগুলোকেই চার-তুকে বাঁধা হলো তা নয়, খেয়াল-ভাঙা এবং খেয়ালী ঢঙের গানেও এর পরে দুই-তুকের জায়গায় চার-তুক দেখা দিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখযোগ্য নটমল্লারের তেলেনা-ভাঙা ত্রিতালের গান "সুখহীন নিশিদিন"। এ ছাড়া ত্রিতালে বাঁধা বহু গান পাওয়া যায় যেগুলি প্রকৃতপক্ষে খেয়ালী রীতির দ্বারা প্রভাবিত যথা ইমনকল্যাণে রচিত "বাজোরে বাঁশরী বাজো", মল্লারের আশ্রয়ে রচিত "ঝর ঝর বরিষে বারিধারা", ত্রিতালের ছন্দে 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের পারে" ইত্যাদি গান। এই সমস্ত গানের ঢঙ যদিও খেয়ালী রীতির অনুরূপ কিন্তু এদের কাব্যাংশের নির্মিতি ধ্রুপদী পদ্ধতির অনুসারী অর্থাৎ চার-তুকে নিবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখের

দাবি রাখে সেতারের গৎ-ভাঙা ছুটো গান "এসো শ্যামল সুন্দর" (দেশ, ত্রিতাল) এবং "মোর ভাবনা রে কী হাওয়ায় মাতালো" (গৌড়মল্লার, ত্রিতাল)। অর্থাৎ বিশুদ্ধ সঙ্গীত এবং বিশুদ্ধ খেয়ালের প্রেরণায় যে গান রচিত হলো সেখানেও গানের স্থাপত্য গড়ে উঠল ধ্রুপদী রীতিতে অর্থাৎ চার-তুকে। বস্তুত সাঙ্গীতিক প্রত্যয়ে সাবালকত্বপ্রাপ্তির পরে রবীন্দ্রনাথ আর দুই-তুকের গান রচনা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। খেয়ালী রীতির যতটুকু বা প্রভাব প্রথম যুগে তাঁর উপরে পড়ছিল, পরবর্তী যুগে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেছিলেন। ফলত গাঠনিক বিচারে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, বাউল, কীর্তন ইত্যাদির মধ্যে কোনোই প্রভেদ নেই। এর প্রধান কারণ হলো এই যে, রাগ-রাগিণীর রূপবিকাশ অথবা বাদীসংবাদী, পকড়, গ্রহ, মূর্ছনা ইত্যাদি ক্লাসিকাল বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রচনা করেন নি; তাঁর গান রচিত হয়েছে কাব্যার্থ ব্যঞ্জিত করার আবেগে। অথবা রচিত হয়েছে বলাও হয়তো ভুল, বলা উচিত আপনা থেকেই জন্মলাভ করেছে। কারণ ব্যতিক্রমগুলো যে সবসময় সজ্ঞানেই সাধিত হয়েছে এমনও নয়; কাব্যব্যঞ্জনার আকর্ষণে ব্যতিক্রমগুলো যেন আপনা থেকেই ঘটে গেছে—চেষ্টার দ্বারা তাদের ঘটানো হয় নি। দৃষ্টান্ত হিসেবে তেওরার ছন্দে এবং বেহাগ রাগের আশ্রয়ে রচিত "দাঁড়াও আমার আঁখির আগে" গানখানির উল্লেখ করা যায়। এই গানের অন্তরা এবং আভোগের "চোখে চোখে" এবং "তোমারি লাগিয়া" অংশদ্বয়ে শুদ্ধ নিষাদের জায়গায় যে কোমল নিষাদ ব্যবহার করা হয়েছে, শুদ্ধ সঙ্গীতের বিচারে তার কোনোই প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু আত্মনিবেদনের যে ব্যাকুলতা কথাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে তার সম্যক পরিস্ফুটন শুদ্ধ নিষাদের দ্বারা সম্ভব ছিল না। একটিমাত্র কোমল স্বরের ব্যবহার সুরব্যঞ্জনার সমস্ত পরিবেশকে অলৌকিক করে তুলেছে। বিবাদী স্বরের যুক্তি এখানে আদৌ খাটে না কারণ প্রথমত বেহাগে বর্জিত স্বর নেই এবং দ্বিতীয়ত বেহাগের নিষাদ ঋষভ অথবা ধৈবতের মতো দুর্বল নয়, এখানে নিষাদ হলো বেহাগের সংবাদী স্বর অর্থাৎ বেহাগের প্রাণের খবর দিচ্ছে—প্রাণটা হলো শুদ্ধ গান্ধার। শুদ্ধ নিষাদ থেকে মীড় টেনে স্বর যখন পঞ্চমে এসে দাঁড়ায় তখনই আমরা চিনতে পারি এ ব্যক্তি বেহাগ ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু, পূর্বেই বলেছি, রাগসঙ্গীত

আর কাব্যসঙ্গীতের ব্যাকরণ এক নয় এবং নয় বলেই এই ভ্রষ্টতা সত্ত্বেও গানখানি এক অনুপম ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এবংবিধ ব্যতিক্রম রবীন্দ্রসঙ্গীতে অজস্র। তালের দিক থেকেও দেখা যায় মূল গানের ভারি ছন্দ তিনি বর্জন করেছেন, যেমন, ত্রিতালের বন্দেজে বাঁধা "বাজে ঝনন ঝনন" গানখানি ভেঙ্গে রচিত হলো "এসো শরতের অমল মহিমা"। এই গানে শুধু যে গান্ধারী রাগ জৌনপুরীতে পরিবর্তন লাভ করেছে তাই নয়, তালটাও বদলে গেছে ত্রিতাল থেকে ষৎ-এ। অনুরূপভাবে আমরা এমন অজস্র গান পেয়েছি যেগুলি বিশেষ কোনো রাগের আশ্রয়ে রচিত কিন্তু তাদের চাল লঘু—দাদরা অথবা কার্ফা। যথা বাহারের আশ্রয়ে দাদরা তালে "আমি তোমারি সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ" ইত্যাদি। এগুলিকে একতাল অথবা ত্রিতালের ভারি ছন্দে বাঁধলে কারো কারো আচারলালিত সাঙ্গীতিক কুসংস্কার হয়তো পরিতৃপ্ত হতে পারে কিন্তু তাতে গানের শ্রী অন্তর্হিত হবে। যেমন দাদরা তালে বাঁধা "প্রখর তপনতাপে" গানখানিকে একতালের বন্দেজে খেয়ালের মতো করে যে গাওয়া যায় না তা নয় কিন্তু তা করলে এই গানের বাণী, ছন্দ এবং সুরের সমন্বয়ে নৈদাঘ প্রকৃতির যে তাপদিগ্ধ অবসন্ন কারুণ্য প্রকটিত হয়ে উঠেছে, সেই সুকুমার লঘুপক্ষতা খেয়ালী দাপটের ঠেলায় পালাবার পথ পাবে না। কাহারবা ছন্দেও এমন অসংখ্য গান আছে যেগুলিকে ত্রিতালের বন্দেজে খেয়ালী ঢঙে গাওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু তার ফলে সেগুলিকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে আর চেনাই যাবে না।

যে কোনো জাতির পরিচয় যেমন তার সাধারণ বিশিষ্টতায় এবং তার দ্বারাই যেমন তার চারিত্র্য সূচিত হয় তেমনি যে কোনো জাতের গানের পরিচয়ও তার চলনের বিশিষ্টতায়, তার বলনের অনন্যতায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যে আমরা শোনামাত্রই অন্য যে কোনো সঙ্গীত থেকে স্বতন্ত্র করে চিনতে পারি সে হচ্ছে তার এই চলনবলনের স্বাতন্ত্র্যের কারণে। এর দ্বারা অবশ্য অপরাপর সঙ্গীতের ঊনত্ব সূচিত হচ্ছে না, বরং স্বীকৃত হচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বকীয়ত্ব। ভালো হোক, মন্দ হোক, এইটে তার নিজস্ব পরিচয়। এই পরিচয় বিশেষ করে সূচিত হয় তার গায়নভঙ্গি এবং রীতির দ্বারা। এই গায়নরীতি পুরোপুরি ধ্রুপদী নয়, খেয়ালী নয় বা কীর্তনীও নয়—এই গায়নরীতিও রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সৃষ্টি। সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে,

গায়নরীতি গানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই রীতিকেই সাঙ্গীতিক পরিভাষায় বলা হয় গায়কি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সৃষ্টির সঙ্গে তার একটা বিশেষ গায়কির নক্সাও সৃষ্টি হয়ে গেছে—এ জিনিষ অনেকের ভালো লেগেছে, অনেকের লাগে নি। 'রাবীন্দ্রিক' অথবা 'শান্তিনিকেতনী ন্যাকামী' বলে এককালে অনেকেই একে ব্যঙ্গ করেছেন। কারো কারো কাছে আবার এই রীতি এফিমিনেসির প্রকারভেদ বলে নিন্দিতও হয়েছিল। যাই হোক ফলকথা হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা নিজস্ব গায়নপদ্ধতি বহুকাল যাবত স্বীকৃত হয়ে এসেছে যা অপরাপর গায়নপদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। এ গায়কি যাদের মনঃপুত হয় নি তারা চিরকাল একে বর্জন করে এসেছেন। এই গায়কি উদ্ভবের একটা প্রায়োগিক ইতিহাসও রয়েছে। শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতভবন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলাদেশের কিছু আলোকপ্রাপ্ত লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে এবং তৎকালীন গায়কগায়িকাদের মধ্যে অপেশাদার মনোবৃত্তি প্রবল হওয়ার ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীত বৈঠকী সঙ্গীত হয়ে উঠতে পারে নি। সেদিনেও রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল গুটিকয় রুচিমান ব্যক্তির নিরালায় ভালো লাগার গান। অনুষঙ্গ (accompaniment) হিসেবে থাকত একটিমাত্র যন্ত্র—হারমোনিয়ম, নয়তো এস্রাজ, নয়তো পিয়ানো, নয়তো অর্গান—প্রায়শ খালি গলায়ই এ গান গাওয়া হতো। তবলা প্রভৃতি তালযন্ত্রের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এর নানাবিধ কারণ থাকা স্বাভাবিক তবে সে আলোচনা এ প্রসঙ্গে অবান্তর। তালযন্ত্রের শাসন না থাকার ফলে গায়কি এক নতুন রূপান্তর লাভ করল যার সাক্ষাৎ ফলশ্রুতি হলো এক নতুন জাতের গান যার সাঙ্গীতিক নাম মুক্ত ছন্দের গান। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখযোগ্য "মেঘের পরে মেঘ জমেছে", "কখন দিলে পরায়ে", "বাজে করুণ সুরে" ইত্যাদি। স্বরলিপিতে যদিও এদের রূপ তালবদ্ধ কিন্তু কার্যত এগুলি বি-তালের অর্থাৎ গদ্যছন্দের গান। কবিতায় গদ্যছন্দের মতো গানে গদ্যছন্দের প্রবর্তকও রবীন্দ্রনাথ।

এযাবৎ আলোচিত তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা হয়তো অন্যায় হবে না যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চায় ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন এই সব কথা বলার মতো অসার্থকতা আর কিছু হতে পারে না। অবিমিশ্র ধ্রুপদ অথবা খেয়াল অথবা কীর্তন রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারে একটিও নেই। না থাকার কারণ এই যে, বাঁধা সড়কের ধ্রুপদীয়া অথবা খেয়ালীয়া অথবা

কীর্তনীয়া হিসেবে চিহ্নিত হবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভাকে নিয়োজিত করেন নি। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন ইত্যাদি সহজ ভাগে বিভক্ত করা মস্ত বড় একটা ভ্রান্তি। পূর্ণাঙ্গ ধ্রুপদ অথবা খেয়াল অথবা টপ্পা অথবা ঠুংরী অথবা কীর্তনের আস্বাদ রবীন্দ্রসঙ্গীতে দুর্লভ—রবীন্দ্রসঙ্গীতে যা পাওয়া যায় তা হলো সূক্ষ্ম কাব্যানুভূতির সঙ্গে সাঙ্গীতিক কল্পনার নিঃশেষে এক হয়ে যাওয়া। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রকৃত অভিধা হলো এককথায় রবীন্দ্রসঙ্গীত—না ধ্রুপদ, না খেয়াল, না টপ্পা, না কীর্তন—শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত। ভারতীয় সঙ্গীতের কণ্ঠে নানান্ সঙ্গীতের নানান্ ধরনের মালা চিরকালই ছিল, চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকবেও আশা করা যায়—বাউল আছে, ভাটিয়ালী আছে, কাজরী আছে, কাওয়ালী আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত তেমনি স্বতন্ত্র এক জাতের সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক প্রত্যয়ের কথা স্মরণ রাখলে তাঁর গানের গায়নরীতির বিষয়ে অন্তত সমস্যা উদ্ভবের কোনো হেতু নেই।

দুই

হেতু না থাকলেই কিছু অহৈতুকী উপদ্রব মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পর্বে এর বিলক্ষণ প্রাবল্য প্রমাণিত সত্য। আড়ানা রাগে বারো মাত্রার ত্রৈমাত্রিক ছন্দের একটা গান যখন সাকুল্যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাঙ্গ হয়ে গেল, সমবেত ওস্তাদমণ্ডলী তখন হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলেন : "আলাপ নেই, তান নেই, বাঁট নেই, এ কেমনতর গান ?" এতে তাঁরা সন্তুষ্ট নন বলেই তাঁরা একে নতুন রূপে বাঁধলেন ; এলো তান, এলো বাঁট, তেহাই দিয়ে গান সমাধা হলো। গানটির নাম "মন্দিরে মম কে আসিলে হে"। এই গানটির কালোয়াতী রূপ আমরা বহুলোকের মুখে শুনেছি, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়। আবার এ গান আমরা শান্তিনিকেতনের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের মুখেও শুনেছি—তাঁদের গানের প্রতিরূপ স্বরলিপিতে নিবদ্ধ আছে ['স্বরবিতান' : ৪র্থ খণ্ড]। রাবীন্দ্রিক গায়কিতে তান-বাঁট কিছুই নেই—নিরাভরণ একটি কাব্যসঙ্গীত। সেযুগে যেহেতু রেকর্ড করবার অনুমতির দরকার হতো না সেইজন্য প্রথমোক্ত ধরনের কিছু কিছু রেকর্ডও বেরিয়েছিল। বেরিয়েছিল বলেই যে সেগুলি রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত এমন মনে করবার অবশ্য কোনো

হেতু নেই এবং এই রকম দৃষ্টান্তও খুব বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় বিরোধী আন্দোলনটা তেমন শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি যেহেতু স্বয়ং স্রষ্টার ভর্ৎসনাকে তাঁরা একটু ভয়ের চোখে দেখতেন। তাছাড়া ১৯৩৪ সালের পর থেকে রেকর্ড বেরুবার পূর্বে অনুমোদন সংগ্রহের একটা শর্তও কোম্পানীগুলোর স্কন্ধে চাপানো হয়েছিল যার পরিণতি হচ্ছে অধুনাতন মিউজিক বোর্ড।

বাংলা গানে যদি রাগরাগিণীর ছায়া থাকে এবং তথাপি যদি তাতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অলঙ্কারের কমতি দেখা যায় তাহলেই তা অসম্পূর্ণ—এই সাঙ্গীতিক কুসংস্কারটির বয়স খুব প্রাচীন। একদা কৃষ্ণনগরে এক গানের বৈঠকে রবীন্দ্রনাথকে গান গাইতে অনুরোধ করায় তিনি গেয়েছিলেন: "বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই"। তান-বাঁট বিবর্জিত সাধারণ একটা গান। কিন্তু এরই জন্য রবীন্দ্রনাথকে সেদিন বড় নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল। ওস্তাদমহল ছাড়বার পাত্র নন, তাঁরা মন্তব্য করলেন: "হ্যাঁ, বাঁশরী অনেকেই বাজাতে চায় বটে কিন্তু সকলেই তা পারে না কারণ বাঁশরী বাজাতে জানা চাই" ইত্যাদি। গান শুনে সন্তুষ্ট না হওয়ার হেতু, বলাই বাহুল্য, যোগ্যতার অভাব নয়, হেতু সেই সাঙ্গীতিক কুসংস্কার। গায়ক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের যোগ্যতা তখনকার দিনে প্রশ্নাতীত।

রবীন্দ্রনাথের লোকান্তরের পরে এই কালোয়াতী আন্দোলনটা আবার মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ করেছে। কিছু কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে যেহেতু কালোয়াতী ধ্রুপদ এবং খেয়াল গানের সাদৃশ্য দেখা যায় সেইহেতু এক শ্রেণীর বাঙালী কালোয়াতের ধারণা হয়েছে যে, ওগুলি আসলে বাংলা ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল এবং টপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলিতে যে পূর্ণাঙ্গ রাগসঙ্গীতের অলঙ্করণ অর্থাৎ তান, বাঁট, বিস্তার ইত্যাদি যোজিত হয় নি তা (এঁদের মতে) হয় রবীন্দ্রনাথের অথবা তাঁর উত্তরসাধকদের অজ্ঞতা এবং অক্ষমতা।

আমাদের সঙ্গীতের একটা প্রাচীন রেওয়াজ এই যে, স্রষ্টার কর্ম যেইমাত্র সমাপ্ত হলো অমনি একজন মিড্‌লম্যান এসে হাজির হন; তাঁর বক্তব্য: "হয়েছে, তোমার কর্তব্য শেষ। এই বেলা বেবাক মালপত্র আমার হাতে দিয়ে দাও। এর পরের কাজ আমিই করব, তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না।" এই মিড্‌লম্যানটির পারিভাষিক নাম হলো ওস্তাদ বা

গাইয়ে। তাঁর প্রকৃতি অনেকটা সরকারী আমলার মতো—শুধু মাইনে নিয়ে তিনি খুশি নন, উপরি পাওনা কিছু না দিলে তাঁর কাছ থেকে কাজ পাওয়াই কঠিন। উপরি পাওনাটা হলো গানে স্বেচ্ছাচারের অবাধ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন মানতে চান নি এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বোধহয় প্রত্যেকটি গানের সুর স্বরলিপির বাঁধনে বেঁধে দিয়ে গেছেন যাতে ওস্তাদের দর্প খর্ব থাকে। ওস্তাদ লোকটাকে তিনি বিলক্ষণ ভয় করে চলতেন যেজন্য তিনি লিখেছেন: "কিন্তু ওস্তাদের হাতে খাদের মিশল বাড়িতেই থাকে। কেননা, ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি, এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। এইজন্য ভারতের বৈঠকী সঙ্গীত কালক্রমে সুরসভা ছাড়িয়া অসুরের কুস্তির আখড়ায় নামিয়াছে। সেখানে তানমানলয়ের তাণ্ডবটাই প্রবল হইয়া ওঠে, আসল গানটা ঝাপসা হইয়া থাকে।" ['সবুজপত্র', ভাদ্র ১৩২৪, পৃঃ ২৫৯]।

ইদানীং কলকাতার এক শ্রেণীর গায়কদের মধ্যে একটা ধুয়ো উঠেছে—রবীন্দ্রসঙ্গীত বড় সাদামাটা, বড় নিরাভরণ; রাগসঙ্গীতের কিছু ভারি এবং জমকালো অলঙ্কার তার অঙ্গে না চাপালে তার চেহারাটার নাকি তেমন খোলতাই হচ্ছে না। ফলত খেয়াল-ভাঙ্গা রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান এবং ধ্রুপদ-ভাঙ্গা রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাঁটের ধুম পড়ে গেছে। প্রথম যুগে ওস্তাদমহলে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে যে উন্নাসিক মনোভাব দেখা গিয়েছিল, বর্তমান আন্দোলনকে তার বংশধর বলা চলে। তখনকার ওস্তাদেরা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বিচার করেছিলেন রাগসঙ্গীতের নিরিখে যেজন্য বিচারে কিঞ্চিৎ বিভ্রাট ঘটেছিল। তাঁরা এই সামান্য কথাটা সেদিন অনুধাবন করেন নি যে, দেশে এমন জাতের সঙ্গীত পূর্বেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকা সম্ভব যার বিচার রাগসঙ্গীতের তুলাদণ্ডে করা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। রাগসঙ্গীত, কাব্যসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের স্বাদ এবং ব্যাকরণ যেমন আলাদা, তাদের বিচারপদ্ধতিও তেমনি স্বতন্ত্র হওয়াই স্বাভাবিক। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ ধরনের বিচারবিভ্রাট আমরা হামেশাই দেখতে পাই। কাব্যবিচারের ভারটা যতদিন আলঙ্কারিকদের হাতে ন্যস্ত ছিল ততকাল তাঁরা অলঙ্কারের নিরিখেই কাব্যের বিচার করেছেন। ফলাফল কি হয়েছিল সাহিত্যসেবীমাত্রেই জানেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাণশক্তির প্রাবল্যে উনবিংশ শতকীয় কালোয়াতী

শিবিরের বৈরিতা ব্যর্থ হয়েছে বটে কিন্তু অন্ততন বাংলাদেশে সেই বৈরিতাই মিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আজকের দিনে যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যথেষ্ট অলঙ্কারমণ্ডিত নয় সিদ্ধান্ত করে তাকে যথোচিত আভরণমণ্ডিত করার স্ব-আরোপিত দায়িত্ব স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন তাঁরা সবাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের আপাত অনুরাগী এবং চর্চাকারী। এর মধ্যে প্রথম উল্লেখের দাবি রাখেন এই রাজ্যের সঙ্গীতনাটক আকাদমির ডীন শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত ধ্রুপদীয়া শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এবং নিজেও হিন্দুস্থানী ধ্রুপদীরীতির একজন প্রবক্তা বলে দাবি করে থাকেন। অবশ্য এঁর কণ্ঠে পূর্ণাঙ্গ হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ শোনার খুব বেশি সুযোগ আমাদের ঘটেনি কারণ রমেশবাবু বেশির ভাগ (এমন কি বেতারেও) ধ্রুপদাঙ্গ এবং খেয়ালাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতই করে থাকেন। ধ্রুপদের বিশিষ্ট এবং প্রধান অঙ্গ আলাপচারিতে এঁর দক্ষতা, স্বকীয়তা এবং রসবোধ পরিমাপ করবার সুযোগ আমাদের বিশেষ ঘটেনি। শিশিরকালীন যে জলসা এবং সম্মেলনগুলিতে মাদৃশ-স্বল্পবিত্ত সঙ্গীতরস সংগ্রহ করে থাকে, সেখানে রমেশবাবুর মতো গায়কের সাক্ষাৎ সচরাচর মেলে না। তবে ত্রৈবার্ষিক রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনে, শতবার্ষিকীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং বেতারে রমেশবাবুর তান-বাঁট লাগানো কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনবার উপলক্ষ আমার ঘটেছিল। রমেশবাবুর গান শোনার পরে এই বিষয়টা আমার সাধ্যমতো অনুসন্ধান করেছি ; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতসম্পর্কিত রচনা এবং বিভিন্ন লেখকের রবীন্দ্রসঙ্গীতবিষয়ক আলোচনাদি পর্যালোচনা করেছি ; রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এমন সাহিত্যিক এবং গায়কদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। অতঃপর যে কয়টি সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে উঠেছে, সেগুলিকে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৎপথবর্তীদের তথা সঙ্গীতজিজ্ঞাসু পাঠকবর্গের গোচরীভূত করতে ইচ্ছা করি। এই প্রসঙ্গে আরো একজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা উচিত—তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বনামখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত। খেয়ালাঙ্গ এবং টপ্পা-অঙ্গের গান পরিবেশনে শ্রীমতী দত্তকেও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে দেখা যায়। জনশ্রুতি এই যে, শ্রীমতী দত্তর অধুনাতন সঙ্গীত-উপদেষ্টা শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তা যদি হয় তাহলে অবশ্য অনুসৃতি বা প্রভাব অস্বাভাবিক নয়। এই সম্পর্কে আমার যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন এঁদের সকলের কাছেই বিনীতভাবে উপস্থিত করছি।

ত্রৈবার্ষিক রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনের এক অনুষ্ঠানে শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে গানটি তানসহযোগে গেয়েছিলেন সেটি হলো "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে"। রমেশবাবু যে সুরে এই গানটি গাইলেন তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বরলিপি-নির্ধারিত সুরের মিল নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত সুরে কোমল ঋষভ থেকে আরম্ভ করে কড়ি মধ্যমের পর্যন্ত ব্যবহার আছে ['স্বরবিতান' : ৪৫]; রাগপরিচয় মিশ্র মালকোশ। রমেশবাবু যে গান গেয়েছিলেন তার সুর মালকোশ। আমাদের জানত স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর দ্বারা আদ্যোপান্ত এবং তুলনামূলক বিচারের পরেই স্বরলিপিগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এই গানের যে এরূপ একটা সুর রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন রচনা করেছিলেন এমন উল্লেখ তো কারো কাছেই আজ পর্যন্ত পাই নি। ইন্দিরা দেবীও উল্লেখ করেন নি। তাহলে এই সুরটা এলো কোথা থেকে ? এ কার রচনা ? কিন্তু রচনার বিচার আপাতত মুলতবি থাক।

যতদূর স্মরণ হয়, গানের চারটি তুক গাওয়া সমাপ্ত করে রমেশবাবু তানগুলো করেছিলেন। তানের মধ্যে সাপেট এবং হলক তানের কথাই স্মরণে আছে। তানের ঢঙ ছিল হিন্দুস্থানী খেয়াল গানের মতো—কখনো প্রথম তাল থেকে, কখনো বা ফাঁক থেকে বিভিন্ন আবর্তের তান করে গানের আট মাত্রার মহড়া আউড়ে সমে এসে পড়েছেন রমেশবাবু ; সমের অক্ষরটাতে হিন্দুস্থানী ঢঙে বেশ একটা গোঁত্তাও মারা হয়েছিল। এই তানের দ্বারা গানের বাণী কোনো অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা লাভ করে নি, সুরের নির্মিতিও কোনো অসাধারণ তাৎপর্যে মণ্ডিত হয় নি। শুনলেই বোঝা যায়, শুধু তানের জন্যই তানগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। বুঝতে কোনোই কষ্ট হয় না যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্কন্ধে এ জিনিস হলো হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রীত্যন্ধতা (mannerism)। এই জিনিসই কি রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ? কৈ, তাঁর কোনো গানেই তো এর ব্যবহার আমরা দেখতে পাই না। ছোটো-ছোটো গিটকিরি, মূর্ছনা এবং টপ্পার ব্যবহার তো রবীন্দ্রনাথ নিজেও করেছেন যেমন তাঁর "ঝর ঝর বরিষে বারিধারা" গানের "হায় গৃহহারা" কথাটার শেষ অক্ষরে প্রত্যেকবারই বারো মাত্রার একটা বোলতান আছে। কিন্তু এই তানটাকে তো কখনো কবিতার বাণীবহির্ভূত অংশ মনে হয় না—এ-তো অতি সহজেই গানের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। আর রমেশবাবুর তান শুনলে মনে হয় ওগুলি গানের অপরিহার্য অঙ্গ নয়, গান থেকে ঐ তানগুলি এমনিতেই আলাদা হয়ে

আছে। গানের শেষে তানের আরম্ভ—আভোগ গাওয়া হয়ে যাওয়ার পরেই গানটাকে যদি আমরা সমাপ্ত মনে করি তাহলে তানগুলো তো গানের বাইরের জিনিস। কথা, সুর এবং অলঙ্কারের সুষ্ঠু সমন্বয়ের যে সাধনা রবীন্দ্রনাথ করেছেন তার সাক্ষাৎ তো আমরা রমেশবাবুর গানে পাই না। "মঞ্জরী, ও মঞ্জরী" গানেও ছোটো তানের কারুকার্য আছে : "হৃদয়", "ঝরি" এবং "ও" কথাগুলিতে। রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত তান কখনো এক আবর্তের বেশি নয় এবং সেগুলি যদি হয় গানের সূক্ষ্ম কারুকর্ম তাহলে রমেশবাবুর তান হলো ক্ষীণকায় কাব্যসঙ্গীতের মাথায় তানের দুই-মণী বোঝা। রবীন্দ্রনাথের গানটা হলো বাংলা আর রমেশবাবুর তানগুলো হলো হিন্দুস্থানী—অনেকটা তেল আর জলের মতো।

"আনন্দধারার" আভ্যন্তরীণ বিচারেও দেখা যাবে এ গান খেয়ালরীতির জন্য আদৌ অভিপ্রেত নয়। শাহ সদারঙ্গের "লাগি মোরে ঠুমক" নামক আস্থায়ী ভেঙ্গে এই গান রচিত। মূল ব্রজভাষার আস্থায়ীটি খেয়ালের রীতি অনুসারে দুই-তুকে নিবদ্ধ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ থেকে যে গান বেঁধেছেন তাতে খেয়ালের উপযোগী দুই-তুক না রেখে ধ্রুপদানুসারী চার-তুক রচনা করেছেন। "বসিয়া আছ কেন" থেকে আরম্ভ করে "শূন্য জীবনে" পর্যন্ত সঞ্চারী এবং আভোগ। সঞ্চারী এবং আভোগের উপরে খেয়াল গানের রূপায়ণ ভারতবর্ষের সঙ্গীতের ইতিহাসে অভিনব ঘটনা বটে। অপিচ মূল গানটি শৃঙ্গার রসাত্মক কিন্তু "আনন্দধারা" শান্তরসের গান।

তানের বিতর্কে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই রবীন্দ্রসান্নিধ্যের উপলক্ষে তাঁদের স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা এবং অভিমত প্রকাশ করেছেন। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ প্রভৃতির আলোচনা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাঁরা একযোগে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, রবীন্দ্রনাথকে এই রীতিতে গাইতে অথবা গান শেখাতে অথবা গাইবার প্রেরণা দিতে তাঁরা কেউ দেখেন নি অথবা শোনেন নি। শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত'-এ এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রচেষ্টাকে "সুরদলন", "রবীন্দ্রসঙ্গীতের বলাৎকার" ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করেছেন। 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর এবং 'বিচিত্রা সভ্য'র প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে জেনেছি তাঁরাও রবীন্দ্রনাথের মুখে এমন কোনো গায়কের প্রশংসা শোনেননি যিনি রবীন্দ্রনাথের গানে তান-বাঁট

সংযোগ করে গেয়েছিলেন। আরো একজন ব্যক্তি আজো জীবিত আছেন যিনি ছিলেন দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী। তিনি হলেন সঙ্গীতভবন-এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার। তাঁর অভিমতও তান-বাঁটের বিপক্ষে। সঙ্গীতভবনের শিক্ষক এবং প্রবীণ ছাত্র-ছাত্রীদের সাক্ষ্যও তান-বাঁট সংযোগের দাবিকে সমর্থন করে না।

বাকি রইলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শ্রীদিলীপকুমার রায় এবং স্বর্গীয় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কবির সঙ্গে একদা যে পত্রযুদ্ধ করেছিলেন, বাংলা-সাহিত্য এবং সঙ্গীতের ইতিহাসে সে কথা অবিস্মরণীয়। তান-বাঁট ইত্যাদির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের যুক্তি ধূর্জটিবাবুর 'সুর ও সঙ্গতি' গ্রন্থটিতে ছড়িয়ে রয়েছে। রবীন্দ্র-দিলীপ পত্রাবলীও প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রকৃতি এবং তাদের পারস্পরিক পার্থক্য সম্বন্ধে কবি তাঁর মতামত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এছাড়া 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধটিতেও তিনি তাঁর সাঙ্গীতিক প্রত্যয় ব্যাখ্যা করেছেন। এই মতামত-গুলো মনে থাকলে রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান-বাঁট ব্যবহার করা রমেশবাবুদের পক্ষে সম্ভব হতো না বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি যুক্তি প্রায়ই শোনা যায়—স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী এবং শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়রা নাকি রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান-বাঁট যোগ করে গেয়ে শুনিয়েছিলেন এবং সেই গায়নরীতি নাকি কবির অনুমোদন লাভ করেছিল। রাধিকাবাবুর গানের রেকর্ড আমরা শুনেছি; যদিও রেকর্ড তবু একটা ভাত টিপলেই তো হাঁড়ির খবর পাওয়া যায়। রেকর্ডে (P2173) রাধিকাবাবু দুটো গান গেয়েছেন—একতালে রামকেলী রাগে "স্বপন যদি ভাঙ্গিলে" এবং ত্রিতালে বাঁধা গান্ধারী রাগে "বিমল আনন্দে জাগোরে"। দুটি গানই খেয়ালের ঢঙে গাওয়া। বস্তুত কেউ যদি গান দুটি শোনেন তাহলে প্রথমেই যে কথাটি তাঁর মনে হবে সেটি হচ্ছে এই যে, বাংলা খেয়ালের আদর্শ নিদর্শন যদি কোথাও থেকে থাকে তাহলে সে হলো ঐ দুটি গান। গানের বাণীটুকু গাওয়ার পরে বিভিন্ন তাল থেকে তান নিয়ে গানের মুখে এসে পড়েছেন গায়ক। রেকর্ডের অর্ধাংশে আছে গান বাকি অর্ধাংশে তান। এত দীর্ঘ মাপের তান রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো গানে কোনোদিন ব্যবহার হতে দেখা যায় নি। বস্তুত এই গান শুনলে কারো মনে হবে না যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনছি; বরং মনে হওয়া

স্বাভাবিক যে, হিন্দী খেয়ালের বাংলা অনুবাদ শুনছি। গান্ধারী রাগে
শ্রীযুক্ত শচীন দেববর্মনের "যদি দখিনা পবন" রেকর্ডের সঙ্গে গায়নরীতির
বিচারে রাধিকাবাবুর গানের কোনোই পার্থক্য নেই। রাধিকাবাবুর
রেকর্ডকে যদি রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে মেনে নিতে হয় এবং এই তানক্রিয়া যদি
রবীন্দ্র-অনুমোদিত হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, বাংলা খেয়াল অর্থাৎ
আধুনিক রাগপ্রধান গানে আর রবীন্দ্রনাথের খেয়াল-ভাঙ্গা গানে কোনোই
তফাৎ নেই। তাহলে কি আমরা সঙ্গত কারণেই বলতে পারি না যে,
সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় সৃষ্টি বলে কিছু নেই? রাধিকাবাবুর
গাওয়া "বিমল আনন্দে" গানটির সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এটিও
একটি বাংলা খেয়াল—রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়। এই গানের একটা রাবীন্দ্রিক
রূপ প্রকাশিত হয়েছে, গেয়েছেন শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই
রেকর্ড বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড-এর অনুমোদিত এবং রবীন্দ্রনাথের সুরের
সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ['স্বরবিতান' : ৪৫]। রাধিকাবাবুর তান এই রেকর্ডে
সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, রাধিকাবাবুর গাওয়া গান দুটোর সুরের ছকটুকু
মাত্র রবীন্দ্রনাথের—সম্পূর্ণ সুরটা রবীন্দ্রনাথের নয়। এই রেকর্ডের স্বরলিপির
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বরলিপির তুলনামূলক বিচার প্রভূত শিক্ষাদায়ক হবে বলে
আমার বিশ্বাস। রাধিকাবাবুর এই সুর রবীন্দ্রনাথ অনুমোদন করেছেন
এমন প্রমাণ নেই বরং প্রকাশ্যে ধিক্কৃত করেছেন এমন প্রমাণের অভাব
আছে বলা যায় মাত্র। তাছাড়া নিন্দা করেন নি বলেই কি বুঝতে হবে
প্রশংসা করেছেন? এমনও তো হতে পারে যে, ভালোও লাগে নি অথচ
নিন্দা করবারও উপায় ছিল না। এই গানের বিরোধী নঞর্থক প্রমাণ
হিসাবে বলা যায় যে, এই গান শোনার পরেও "বিমল আনন্দে জাগোরে"
গানের স্বরলিপিটি তিনি 'স্বরবিতান'-এ স্থান দিয়েছেন। সেটাকে বর্জন করে
রাধিকাবাবুর গানের স্বরলিপিকে তার স্থানাভিষিক্ত করার নির্দেশ দেন নি।
তাঁর প্রত্যক্ষ শিক্ষণের অধীন ছাত্রছাত্রীদের এই সুর না শিখিয়ে তাঁর
পূর্ববর্তী সুরই শিখিয়ে গেছেন। সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ,
অমলা দাশ, কনক দাশ, শৈলজারঞ্জন, শান্তিদেব, সুবিনয় রায়—কারো মধ্যেই
আমরা রাধিকাবাবুর সুরের প্রভাব খুঁজে পাই না।

গান শোনানোর পর রবীন্দ্রনাথ যদি রাধিকাবাবু অথবা গোপেশ্বর-

বাবুদের তারিফ করে থাকেন তবে সেটা সাধারণ সৌজন্য হিসেবেই গ্রহণীয়,
অনুমোদনের লক্ষণ হিসেবে নয়। আর রাধিকাবাবুর গানের প্রশংসা করেছেন
হিন্দুস্থানী পদ্ধতির গান হিসেবে, রবীন্দ্রসঙ্গীত হিসেবে নয়। এই প্রসঙ্গে
দিলীপবাবুকে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন: "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকার তাঁদের
সুরের মধ্যেকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা চেয়েছিলেন।......কিন্তু
আমার গানে তো আমি সে রকম ফাঁক রাখি নি যে সেটা অপরে
ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।" এইজন্যই বোধহয়
রাধিকাবাবুর রেকর্ড সম্বন্ধে সারাজীবন তিনি নীরব থেকে গেছেন;
প্রখর সৌজন্যবোধের জন্য হয়তো সমালোচনা করতে বেধেছে। এই
নীরবতা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ওস্তাদ
হিসেবে রাধিকাবাবুর গুরুত্ব লাঘব করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার
বিনীত বক্তব্য এই যে, রাধিকাবাবুর রেকর্ড রাধিকাবাবুরই নিজস্ব সৃষ্টি,
রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে তার যোগ নেই—রবীন্দ্রসঙ্গীতের আদর্শ হিসাবে তা কদাপি
গ্রহণীয় নয়।

আর রাধিকাবাবুর দোহাই দিয়ে রমেশবাবু পার পাবেন কি করে?
রাধিকাবাবু তান করেছেন সত্যিকারের বাংলা খেয়াল গানে যার বাণী দুই-
তুকে নিবদ্ধ কিন্তু রমেশবাবু তান করেছেন চার-তুকের ধ্রুপদাঙ্গ গানে।
গায়ক হিসেবে এখানেই তিনি ভ্রষ্ট। এর পরে যদি তিনি যাবতীয় ত্রিতাল,
একতাল এবং ঝাঁপতালের চারটে তুকে তানক্রিয়া করতে থাকেন তাহলে
বাংলা খেয়াল এবং রাগপ্রধান গানের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোনোই পার্থক্য
থাকবে না। রমেশবাবু ইচ্ছা করলে "মেঘের পরে মেঘ জমেছে" গানটাকেও
তো ত্রিতালের বন্দেজে ফেলে তাতে কষে তান লাগাতে পারেন। তবে সামান্য
অসুবিধে হবে এই যে, তানের ঠেলায় মেঘ আর জমবার অবকাশ পাবে না,
তার আগেই হাওয়া হয়ে উড়ে যাবে। ইচ্ছা করলে "সমুখে শান্তি পারাবার"
গানটিতেও তো অনুরূপ ভাবে তান করতে পারেন, বাধা দিচ্ছে কে? এটাও
খেয়াল-ভাঙ্গা গান এবং এটার বন্দেজও ত্রিতালের! তৎপূর্বে রবীন্দ্রনাথের একটি
উক্তির প্রতি রমেশবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করব: "কিন্তু যদি আনন্দের সঙ্গে
তানের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে ফল উল্টাই হয়। তাহা হইলে
গান কেবল দুর্বল হইতে থাকে। সে তানে নিয়ম যতই জটিল এবং বিশুদ্ধ
থাকনা কেন গানকে সে কিছুতেই রস দেয় না, তাহা হইতে সে কেবল হরণ

করিয়াই চলে"। রমেশবাবুর তান গানের কোনো আনন্দানুভূতিকে ব্যক্ত করে
না বলেই তা ব্যর্থ। রমেশবাবু যে তান করেন তা কাব্যসঙ্গীতের তান নয়, তা
হলো খেয়াল অর্থাৎ শুদ্ধ সঙ্গীতের তান। কাব্যসঙ্গীতের তান রবীন্দ্রনাথ
নিজেই যোগ করে গেছেন, পুনঃসংযোজনের অবকাশ রেখে যান নি।

কালোয়াতী সঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম প্রধান পার্থক্য শব্দ
উচ্চারণের পদ্ধতিতে। ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রধান তাল হলো চৌতাল, এর গতি
দ্বিমাত্রিক—তার চলন অনেকটা লেফ্‌ট-রাইটের মতো। এই দ্বিমাত্রিক
ছন্দের প্রভাবে গানের বাণী কাটা কাটা ভাবে উচ্চারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ
তাঁর ধ্রুপদ-ভাঙ্গা গানে বাণীর উচ্চারণকে কাব্যিক আবৃত্তির অনুসারী
করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানের উচ্চারণ হিন্দী প্রভাবিত নয়, বাংলা
উচ্চারণের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এতে বজায় রাখা হয়েছে। ধ্রুপদী উচ্চারণের
বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যেক পর্বের অর্থাৎ তালের প্রথম অক্ষরটিকে একটু ধাক্কা
দিয়ে উচ্চারণ করা যার ফলে একটা অল্পপ্রাণ বর্ণও অনেক সময় মহাপ্রাণ
বর্ণে রূপান্তরিত হয়। ব্রজভাষার অথবা হিন্দুস্থানী যে কোনো একটা ধ্রুপদের
কাব্যাংশ গাইলেই একথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে এই রকম
আঘাত সৃষ্টি করার রেওয়াজ নেই। আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো
সমের অক্ষরটাতে এসে আঘাত করে দাঁড়ানো—এটিকেও রবীন্দ্রনাথ বর্জন
করেছেন। কিন্তু রমেশবাবুরা যখন "বাণী তব" গানটি করেন তখন গানের
বাণীগুলিকে উচ্চারণ করেন হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের রীতিতে। রবীন্দ্রনাথের
গানের বাণী, সুর এবং অলঙ্কার মিলে এক অখণ্ড ঐক্যে সমন্বিত হয়েছে।
কিন্তু রাধিকাবাবু বা রমেশবাবুর গানে এই অখণ্ড ঐক্যের সমাবেশ নেই।

বাঁট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি অভিমত এখানে উদ্ধৃত করছি।
"তোমাদের (ধূর্জটিবাবুদের—লেখক) ওখানে গানের মজলিশে ছায়ানট
গাওয়া হয়েছিল। ......ছায়ানটের যত রূপান্তর আছে, তান-কর্তব, সারেগম,
যত রকম লয়ে-বিলয়ে তাকে উল্টানো-পাল্টানো যেতে পারে তার কিছুই
বাদ পড়ে নি। আমার অভিমত জানতে চাও, সময় খারাপ, বলতে সাহস
করিনে।......সুন্দরীর গায়ে যখন মানানসই একখানি মাত্র শাড়ি দেখি,
বলি বাস্‌ হয়েছে, বলিনে ক্রমাগত সব কটা শাড়ি ওর গায়ে চাপালে ভালোর
মাত্রা বাড়তেই থাকবে......ইংরেজি ভাষায় বলতে পারি, যদি ক্ষমা করো,
art is never an exhibition, but a revelation" ['সুর ও সঙ্গতি',

পৃঃ ৯—১১]। রমেশবাবুরা যখন "বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে গগনে লোকে
লোকে" কথাগুলোকে চৌতালের ছন্দে দুনে চৌদুনে বণ্টন করে দেখান,
তাতে কৌশলের পরিচয় থাকে বটে কিন্তু সুন্দরের রিভিলেশান থাকে না।
সেইজন্যই এই লয়-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "সঙ্গীতের যক্ষ-
ভাণ্ডার থেকে তালের পর তাল আসতে লাগল দুন চৌদুন বেগে, বাহবা
দিতে দিতে তোমার গলা যায় ভেঙ্গে। মূল্যের কথা কেউ অস্বীকার করতে
পারবে না ; কিন্তু সে মূল্য যক্ষরাজের খাতাঞ্চিখানার।" রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর
গানে তান-বাঁটের ব্যবহার অনন্থমোদন করেছিলেন, এই উদ্ধৃতিগুলি হচ্ছে
তারই অকাট্য প্রমাণ।

যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি রমেশবাবুর দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তার
মধ্যে আশ্চর্য এবং শোচনীয় দৃষ্টান্ত হলেন শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত। শ্রীমতী
দত্ত শান্তিনিকেতন সঙ্গীতভবনের প্রাক্তন ছাত্রী এবং সেই কারণেই তাঁর
মধ্যে কোনো বিচ্যুতি দেখলে আমরা স্বভাবতই ব্যথিত না হয়ে পারি না।
গত ৭ই মে সকালে কলকাতা বেতারে "স্বপন যদি ভাঙ্গিলে" গানখানি তিনি
যেভাবে গেয়েছেন, তার সঙ্গে বাংলা খেয়াল অথবা রাগপ্রধান গানের পার্থক্য
কোথায় বা কতটুকু? সুরকার হিসেবে হিমাংশু দত্ত মহাশয় এবং রবীন্দ্র-
নাথের মধ্যে যে একটু পার্থক্য আছে (যতটুকুই হোক), আশা করি শ্রীমতী
দত্ত তা অনুধাবন করে দেখবেন। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় ত্রিতাল এবং
একতালের গানগুলি যদি এই রীতিতে গাওয়া যায় তাহলে তার মধ্যে
রবীন্দ্রত্ব কতটুকু থাকবে? মুক্ত ছন্দের গানগুলির বেলায়ই বা কি ব্যবস্থা—
এ জিজ্ঞাস্যটুকুও শ্রীমতী দত্তর কাছে রাখছি। অথচ "স্বপন যদি ভাঙ্গিলে"
গানটির একটা রাবীন্দ্রিক সুরও আছে—কলকাতা বেতার থেকে মে মাসের
এগারো তারিখের সকালে শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সুরটি গেয়েছেন।
এতে সংক্ষিপ্ত টপ্পার অলঙ্করণ আছে কিন্তু লহরে লহরে তান নেই। এ গান
আদৌ তালের গানই নয় যেমন নয় "বাজে করুণ সুরে"। শ্রীমতী দত্ত একথাও
নিশ্চয়ই মানবেন যে, রাধিকাবাবুর সুর যদি রবীন্দ্রনাথের এতই অনুমোদিত হতো
তাহলে তার একটা স্বরলিপি করিয়ে সঙ্গীতভবনে সেটা শেখানোর ব্যবস্থা
তিনি অনায়াসে করে যেতে পারতেন এবং 'স্বরবিতান'-এও তাকে স্থান দিতে
পারতেন। এই নিষ্ক্রিয়তা কি খুব তাৎপর্যপূর্ণ নয়? আশী বছরের সুদীর্ঘ
জীবনে কোনো অনুষ্ঠানেই যে তিনি রাধিকাবাবুর ঢঙে একটা গানও কাউকে

দিয়ে গাওয়ালেন না—এ ঘটনাও কি কম তাৎপর্যের? আর একথাও কি শ্রদ্ধেয় যে, রবীন্দ্রনাথ মুখে বলেছেন এক কথা আর কাজে শিখিয়েছেন অন্য রকম?

রমেশবাবু এবং শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত নিশ্চয়ই জানেন, ভারতবর্ষে রাগাশ্রিত এমন বহুগীতরীতি আছে যাতে তান এবং বাঁটের দৌরাত্ম্য নেই, খোদ ধ্রুপদেই তো তান নিষিদ্ধ। লখ্‌নউ এবং বেনারসী ঘরানার ঠুংরিতে তান করা নিন্দনীয়। রাগাশ্রিত কীর্তন গানে তানও নেই, বাঁটও নেই। কালোয়াতী গানেই যদি তান বর্জিত হতে পারে তাহলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো মেজাজী কাব্যসঙ্গীতেই বা তা হবে না কেন? তাছাড়া রাগের আশ্রয় আছে বলেই কি রবীন্দ্রসঙ্গীত রাগসঙ্গীত? "এবার নীরব করে দাও" অথবা "দাঁড়াও আমার আঁখির আগে" গানে যে স্বরসমন্বয় আছে তার দ্বারা কোন রাগের পরিচয় সূচিত হচ্ছে? রমেশবাবু এবং রাজেশ্বরী দত্ত কি এমন কোনো কালোয়াতের সন্ধান জানেন যিনি রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ইমন-কল্যাণ অথবা বাগেশ্রীতে বর্ষার গান রচনা করেছেন? এটা কি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুমোদিত? রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক প্রত্যয়ে অনাস্থা প্রকাশ করবার অধিকার রমেশবাবুর এবং শ্রীমতী দত্তর নিশ্চয়ই আছে; রবীন্দ্রনাথের কোনো গানকে তাঁরা যদি যথেষ্ট অলঙ্কৃত বিবেচনা না করেন তাহলে সেগুলিকে মন্দ বলবার অথবা সেগুলিকে বর্জন করার অধিকারও তাঁদের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেগুলিকে নিজ খেয়াল-খুশিমতো সংস্কৃত করার অথবা তাতে স্বকীয় অলঙ্কার সংযোজনের অধিকার তাঁদের আছে কি? তাঁরা কি শেক্স্পীয়রীয় নাটকের সংলাপে কোনো সংযোজন করতে পারেন? পারেন কি তাঁরা পাশ্চাত্ত্য কোনো সুরকারের রচনায় হস্তক্ষেপ করতে? অথচ পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের গুণগানে এঁরাই আবার পঞ্চমুখ। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে শিল্পীর স্বাধীনতা কতটুকু তা কারো অজানা নেই। তবু তো পাশ্চাত্ত্য নিবদ্ধসঙ্গীত মরে যায় নি। তাহলে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কেই বা এই অহেতুক দুশ্চিন্তা এবং জবরদস্তির হেতু কি? পুনশ্চ অলঙ্কৃত গানই দীর্ঘজীবী, অনলঙ্কৃত গান নয়—এ সিদ্ধান্তের পিছনেও ইতিহাসের সমর্থন নেই। এককালে বাংলা দেশে 'চর্যাপদ' এবং 'গীতগোবিন্দ'-এর পদ রাগসঙ্গীতের প্রভাবে গাওয়া হতো। কিন্তু আজ তাদের সুরের বা রীতির হদিশ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে যে হিন্দুস্থানী-মার্কা বাংলা গানের প্রচলন হয়েছিল, তারা আজ কোথায়? তারা বাঁচতে পেরেছে কি? অথচ কাওয়ালী, কীর্তন, হিন্দুস্থানী ভজনগীতি এবং লোকসঙ্গীত আজো বেঁচে আছে। অনলঙ্কৃত গান যদি ক্ষীণজীবী হতো তাহলে এদের তো এতদিনে যমালয়ে জায়গা হওয়ার কথা।

আর একটি পুরনো রেকর্ডের প্রতি আমি শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—শ্রীহরেন দত্তর গাওয়া "এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর" (P6574)। শ্রীমতী দত্ত নিশ্চয়ই এই গানের সুরের সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত আছেন। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলতে পারি—এই রেকর্ড শুনলে তিনি আমার চেয়েও অবাক হয়ে যাবেন। শ্রীহরেন দত্ত যেভাবে গানটার মধ্যে স্থানে অস্থানে গিটকিরি মেরেছেন তাতে রবীন্দ্রসুরের খোলসটুকুই মাত্র আছে, প্রাণটা নেই। হরেনবাবুর আড়ির ছন্দ, ঝট্‌কা, গিটকিরি ইত্যাদি কর্ণগোচর না করে লিখে বোঝানো কঠিন। আশা করি শ্রীমতী দত্ত রেকর্ডটি সংগ্রহ করে শুনে নেবেন। রাজেশ্বরী দেবী কি এই গান এই ঢঙে গাইবেন? রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের দ্বারা রেকর্ড হয়েছে বলেই এগুলি তাঁর অনুমোদিত, এর চেয়ে কুযুক্তি আর কিছু হতে পারে না। সন্দেহ নেই যে, এই সব ভদ্রলোকেরা রবীন্দ্রনাথের সুজনতা এবং সহনশীলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সকলেই তাঁর গানের পিছনে আপন আপন পাণ্ডিত্যের লেজুড় জুড়ে দিয়েছেন। আর এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল এমন সময়ে যখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে একটা স্বতন্ত্র গায়নরীতি ও বৈশিষ্ট্য আছে, একথাটা তখনো পরিপূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেনি। তখনকার গাইয়েরা এই সামান্য কথাটা মেনে নিতে পারেন নি যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, বাইরে থেকে তার মধ্যে যোগ করার মতো কোনো অবকাশ রচয়িতা রাখেননি। সেরকম অবকাশ থাকলে তিন হাজার গানের স্বরলিপির কোনো না কোনোটাতে আমরা তান অথবা বাঁটের দেখা পেতাম।

এই ধরণের এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন বলেই তিনি বলেছেন: "আমার গানের **বিকাশ** প্রতিদিন আমি এত শুনেচি যে আমারও ভয় হয় যে আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়ত সম্ভব হবে না।" তার সাম্প্রতিক প্রমাণ আমরা রমেশবাবু এবং শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তর মধ্যেই দেখছি—তাঁদের গানে যে পরিমাণগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে

তার ফলে গুণগত পরিবর্তন না হয়েই পারে না। এই নতুন রীতির গানকে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতরূপে গ্রহণ না করে বলা উচিত কালোয়াতী রবীন্দ্রসঙ্গীত, অথবা রমেশসঙ্গীত আখ্যা দেওয়াই বোধহয় অধিকতর বৈজ্ঞানিক।

কিছু খেয়াল-ভাঙ্গা এবং টপ্পা-ভাঙ্গা গান শান্তিনিকেতনে চিরকাল মুক্ত-ছন্দে গীত হয়ে এসেছে। মুক্তছন্দের গানগুলি কোন রীতিতে গাওয়া উচিত তার নির্দেশ রবীন্দ্রনাথের নিজের রেকর্ড থেকেই তো তাঁরা নিতে পারতেন। ভৈরবীতে বাঁধা "অন্ধজনে দেহ আলো" গানখানি স্বরলিপিতে ত্রিতালের ছন্দে আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ গানটি গেয়েছেন মুক্তছন্দে (P8367)। ফলে সুরের যে একটু পার্থক্য হয়েছে তার পরিচয় পুরনো স্বরলিপি এবং রেকর্ডের স্বরলিপির তুলনামূলক বিচার থেকেই প্রমাণ হবে ['স্বরবিতান' : ২৭, পৃঃ ৭ এবং ৮৮]। অনুরূপ রীতিতে রবীন্দ্রনাথ আরো একটি গান রেকর্ড করেছেন, সেটি হচ্ছে "তবু মনে রেখো" (H. 1.)। পুরনো স্বরলিপি এবং রবীন্দ্র-রেকর্ডের স্বরলিপিতে যে পার্থক্য আছে ['স্বরবিতান' : ৫০, পৃঃ ৭২-৭৫] তার দ্বারা একথাই প্রমাণ হবে যে মুক্তছন্দের গান তালবদ্ধ ভাবে গেয় নয়। প্রায়োগিক ইতিহাসের মাধ্যমে মুক্তছন্দের গানের গায়কির যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে সেগুলিকে তালবদ্ধ করে গাওয়ার অত্যুৎসাহ সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতা এবং রসবোধের পরিচায়ক নয়। রবীন্দ্রনাথের গাওয়া যদি হয় গেরস্থবাড়ির আলপনা তাহলে রমেশবাবু-রাজেশ্বরী দেবীর গাওয়াকে বলব আর্ট কলেজের আলিম্পন। কালোয়াতী-রবীন্দ্রসঙ্গীত গানে এবং অলঙ্করণে পরিপূর্ণ ঐক্যে সার্থক হয়ে ওঠে না।

রবীন্দ্রনাথ বহুবার দেশবাসীর কাছে মিনতি জানিয়েছেন যাতে তাঁর গানগুলো **তাঁর সুরে তাঁর মতো করেই** গাওয়া হয়; যাতে ওগুলিকে তাঁর গান **বলেই** চেনা যায়। তিনি আরো অনুরোধ করেছেন, সাঙ্গীতিক স্থূলতার স্টীম রোলার যেন তাঁর গানের উপর দিয়ে চালানো না হয়। আজ দেখা যাচ্ছে, ভদ্রলোকের ঐ কাতর আবেদন বধির কর্ণে নিপতিত হয়েছে। তবু আমরা আশা করব, শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত আমাদের কথাগুলো অনুধাবন করবার চেষ্টা করবেন। আমরা আরো আশা করব, তাঁদের গায়নের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত রবীন্দ্রসঙ্গীতই থাকবে; অন্য কিছু, কোনো রবীন্দ্রতর-সঙ্গীত, হয়ে উঠবে না।

প্রবন্ধটি বিতর্কমূলক। বিশেষত শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত সম্পর্কে লেখকের সিদ্ধান্ত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আমরা এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আহ্বান করছি—সম্পাদক

জতুগৃহ

বিজন ভট্টাচার্য

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[অধ্যাপক রসময় গুপ্ত-র স্টাডি। সকালবেলা। আরাম কেদারায় শুয়ে মোটা একখানা বই পড়ছেন হাতলের ওপর রেখে। বুদ্ধিদীপ্ত প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রসন্ন চেহারা সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। চোখে কালো ফ্রেমের মোটা চশমা। মুখে চুরুট। পাশের সেণ্টার-টেবিলে স্তূপাকার বই। কাঠের দুই ব্লেডওলা পুরনো মডেলের একটি ফ্যান এক পয়েণ্টে মাথার ওপর ঘুরছে। দরজায় জানালায় ভারি স্ক্রীন। নিঃস্তব্ধ পরিবেশ।

ভৃত্যসহ স্ত্রী সুহাস-এর প্রবেশ। ভৃত্যের হাতে ট্রে-তে কফির সরঞ্জাম। কফি দিয়ে ভৃত্য চলে গেলে সুহাস কফি বানাতে থাকেন নারী চরিত্রের সেই সব বিশিষ্ট গতিপ্রকৃতি নিয়ে, স্থূলাঙ্গিনী হয়েও যা গোটা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ধীর মন্থরে সভ্যশালীন।]

সুহাস : হ্যাগা, অসীম নাকি রিসার্চ স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যাচ্ছে?

রসময় : উঁ,—হ্যাঁ।

সুহাস : ঠাকুমা মত দিলেন? [কফি দেন]

রসময় : [উঠে বসেন] তা এখন সে কালাপানি তো আর কালাপানি নেই। কালাপানি হয়েছে গঙ্গাজল। গঙ্গাসাগর-মেলার যাত্রীর মতোই লোকে এখন বিলেত আমেরিকা যাচ্ছে।

সুহাস : যাচ্ছে বলে যাচ্ছে। খোদ লণ্ডন শহরে বাঙালীরা এখন নাকি শুনি খুলনা সমিতি, যশোর সমিতি খুলে বসেছে। কে-এক দত্ত নাকি সেখানে হোটেল খুলে বসেছে কংশ বলছিল; কালোজিরে, সরষে-বাটা আর কাঁচালঙ্কার ছড়াছড়ি সেখানে। সে ইলিশ মাছের পাতুরি নাকি তুমি বাংলাদেশেও খেতে পাবে না। অথচ আগে শুনতুম এই বিলেত যাওয়া নিয়ে সে কত হাপা!

রসময় : তারও কারণ ছিল। তখনকার দিনে ছেলেপুলে বিলেত যাবে শুনলে মা বাপ ভাবত ম্লেচ্ছ হয়ে যাবে ছেলে। জাতকুল ডুবিয়ে ফেরবার সময় নির্ঘাত একটি মেমসাহেব বিয়ে করে আনবে। পরে যুগধর্মে সে ভয়টাও অনেকটা কেটে গেল। ব্রহ্মণ্যতেজের সঙ্গে ইণ্ডিয়া হাউসে স-টিকি তিন-চার বছর কাটিয়েও সেই ছেলে আবার বাংলাদেশে ফিরে এসে কুলুজী কোষ্ঠী মিলিয়ে পালটি-ঘরে বিয়ে করে ঘর-সংসারী হলো, তারও নজির আছে।...নৈরাজ্যবাদী নৈরেকার হলো তার অনেক পরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু থেকে ও তার পরবর্তীকালে। উগ্র জাতীয়তাবাদ খতম হলো তো এলো তোমার গিয়ে খানিকটা পোস্ট সেভেনটিন এইট্টি নাইনের আবহাওয়া। বিশ্বপ্রেম-সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার যুগ—গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় আবার মালাবদল শুরু হলো, বিক্রমপুরের ছেলে বিয়ে করে আনল আমেরিকান বউ, কেউ নরউইজিয়ান, কেউ সুইডিস, কেউ জার্মান; তোমার ছেলে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে বিয়ে করে নিয়ে এলো যেমন স্কচ্-মেয়ে। ...অবিশ্যি ভালো বুঝেছে বিয়ে করেছে সে-কথা নয়, আসলে কি জানো, এই মন দেয়া-নেওয়ার ব্যাপারটা আমার মনে হয় বিদেশিনীর সঙ্গে তেমনটি জমে না। অবিশ্যি জানি না, আমার ক্যালকুলেশন সত্যি না-ও হতে পারে।

সুহাস : আবার সত্যি নয় তো কি? তোমার আস্কারা পেয়ে পেয়েই তো ছেলেপুলে আজ এতটা স্বাধীনচেতা হয়ে উঠেছে। ...বাপমায়ের ইচ্ছে জলাঞ্জলি দিয়ে কংশ কিনা বিয়ে করে আনল একজন মেমসাহেব; বীরু একজন বিয়েই করল না, কি না স্ত্রীলোক তার জীবনে 'স্যাট্' করবে না। ছোট ছেলে অমল যদি বা বিয়ে করে ঘরসংসারী হলো তো ভোগবাসনা তার বাড়তে বাড়তে এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে কুবেরের সম্পদেও তার নিবৃত্তি নেই। টাকা আর টাকা, সে একেবারে হন্তে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভূ-ভারত। অথচ ছাখো, তাতেও কি শান্তি আছে?

রসময় : দুঃখ করো না, দুঃখ করো না। দুঃখু করে কোনো লাভ নেই। কার্পণ্য তো কিছুই করো নি। অর্থে, সামর্থ্যে, ছেলেদের জন্যে যতটুকখানি যা করবার মোটামুটি সবই করেছ। এখন তারা যদি তাদের কর্তব্য না করে তো...

সুহাস : আমি কিছুই চাই না। আমি নিজে কি কিছু প্রত্যাশা করি রে! শুধু ভাবি যদি কোনো কাজে লাগি তোদের, এখনও। তা তোরা যদি মনে করিস প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে আমার, তো নিস না পরামর্শ।

রসময় : কি জানো, জীবনে যদি আদর্শবাদ একটা না থাকে তো দাঁড়ানো বড্ড মুস্কিল। কোনো একটা কিছুতে স্থির বিশ্বাস দরকার।

সুহাস : ছেলে বিয়ে দেব, ঘর সংসার করব, কত আশা করেছিলাম। হুঁঃ, কোথায় ঘর আমি বাঁধব না ঘর আমার আরও ভেঙে গেলো।

রসময় : ঐ তো, কথা বল্লেই তোমার খালি হা-হুতাশ আর আত্মানুশোচনা। অত দুঃখ করো কেন?

সুহাস : রাখো রাখো, বোকার মতো কথা বোলো না। তোমরা বেটা-ছেলেরা পাঁচটা বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকো, দরকারী অদরকারী পঞ্চাশটা ঝামেলায় সময় কাটে তোমাদের। কিন্তু মেয়েরা, মেয়েরা কি করবে শুনি? এক তোমাদের পরিচর্যা...

রসময় : কেন, বাইরের কাজও তো করছেন দেখি আজকাল মেয়েরা।...

সুহাস : তিনটে মেয়ে কেরানী হলো কি আর সমস্যা মিটে গেল মেয়েদের। কি যে বলো তার মাথামুণ্ডু নেই।

রসময় : তা অবিশ্যি বটে।

সুহাস : তো তবে?...তা সে যাই হোক মেয়েরা না হয় না-ই করল বাইরের কাজ, ঘরে কাজ আছে ঘরেই রইল তারা—সেবাব্রত, সাংসারিক দায়দায়িত্ব, সব কিছু সুষ্ঠুভাবে—করা সে-ও তো তোমার চাড্ডিখানি কথা নয়। কিন্তু এই সেবাধর্ম সংসার প্রতি-পালন, এ সব থেকেও যদি বঞ্চিত করে রাখা হয় তাদের তো তারা কি নিয়ে থাকবে বলতে পারো? স্বামীপুত্রের গৌরবে গরবিণী হবার স্বাভাবিক অধিকারটুকুও যদি তারা না পায়—কেন, আমি কি কিছু বেশি চেয়েছিলাম সংসারের কাছে!

[কল্যাণীর প্রবেশ]

কল্যাণী : ও, হোম পলিটিক্স ! যাই বাবা !

রসময় : আহা, কি বলবে বলে এসেছিলে বলেই যাওনা, শুনবেন মা।

সুহাস : [মেয়েকে] চিপটেন কেটে কথা বলতে শিখছিস খুব তোরা। পলিটিক্সটা আবার কি হলো শুনি ? ঝক্কি তো আর নিতে হলো না।

কল্যাণী : না বাবা, কেউ কোনো ঝক্কি নেয় নি, গোটা সংসারটা তুমি একা চালাচ্ছ, হলো তো !

সুহাস : [রসময়কে] শুনলে, শুনলে মেয়ের কথা, ছাখ কল্লু···

রসময় : [চতুর হেসে] একেবারে Scathing যাকে বলে। ইস্, এটা কল্যাণী তোমার···

সুহাস : [মেয়েকে] তোদের এই ঘোরানো প্যাঁচানো কথার—ভাবিস খুব বড় বড় একজন বুঝদার হইছিস তোরা, তুই একজন, তোর দাদা একজন···[রসময়কে] আর তুমি বুড়ো-মানুষ, মুখ টিপে হাসছ তোমার লজ্জা করছে না ?

রসময় : [সমঝে] এই কল্লুই তো এসে সব গণ্ডগোল বাধালে। না না, এ তোমার ভারি অন্যায় কল্যাণী, যাই বলো।

কল্যাণী : বারে, আমি আবার কি অন্যায় করলুম !

রসময় : না না, একটা subtle অন্যায় হয়েছে। You must admit.

সুহাস : [রসময়ের প্রতি] থাক, আর ব্যাখ্যানে কাজ নেই তোমার।

রসময় : আচ্ছা চুপ, এই চুপ করলাম।···কি বলতে এসেছিলে বলো মাকে স্পষ্ট করে, হ্যাঁ।

কল্যাণী : আমি বলতে এসেছিলাম, আমার একটা জায়গায় বেরুবার কথা ছিল বিকেলে। আমার এক বন্ধুর বাড়ি। সে ফোন করেছে। কি করব ?

সুহাস : বেরোবার কথা ছিল, এদিকে আমরা সব যোগাড়যন্তর করে বসে আছি, কথা দিয়েছি ভদ্রলোককে—তুমি আমায় আগে কেন বল্লে না ? আগে জানলে আমি কক্ষনো···

কল্যাণী : আমি সেই কথাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম, ঠিক আছে বেরুব না।

রসময় : Not to day. Make it to-morrow. To-morrow there

will be no fooling and no dusty death. কালকে করো appointment, কেমন ?

কল্যাণী : As you like it. বেশ !

[প্রস্থান]

রসময় : একটা কথা ছিল সুহাস।

সুহাস : কি ?

রসময় : শোনো, বোসো। কথাটা হচ্ছে, রঞ্জনকে তোমাদের ভালো লেগেছে, কল্যাণীরও কি ঠিক ভালো লেগেছে ?

সুহাস : ভালো লেগেছে মানে ?

রসময় : ভালোলাগা বুঝতে পারো না ? কি বলব···

সুহাস : হ্যাঁ, সে ওপর ওপর যতটা বুঝি তাতে করে ভালো না লাগার তো কোনো কারণ দেখি নে। তবে ভেতর ভেতর মেয়ের এখন কি মনোভাব···

রসময় : সেইটেই তো বুঝতে হবে। রঞ্জন আসে-মেশে ভালো কথা। কিন্তু ব্যবহারিক ভদ্রতা এক, অনুরাগ জিনিসটা আর এক।

সুহাস : যখন সম্বন্ধ করেই বিয়ে হচ্ছে তখন অনুরাগের প্রশ্নটাই বা বড় করে ধরছ কেন তুমি। সমৃদ্ধ বড় বংশের ছেলে, শিক্ষিত, মার্জিত রুচি, সুদর্শন চেহারা, বীতরাগের তো কোনো কারণ দেখি নি মেয়ের। আর ধরো কথায় বলছি, কোনো কারণে মেয়ের যদি অপছন্দই হয়, সে ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধ কি তুমি হাতছাড়া করতে পারো ? মঙ্গলামঙ্গল দেখতে হবে না মেয়ের ?

রসময় : নিশ্চয় নিশ্চয়।

সুহাস : আর তা ছাড়া হাবভাবে তো বুঝতে পারি। মিশছে, হাসছে, খেলছে, বেড়াচ্ছে।

রসময় : সেইটুকুই তো শুনতে চাচ্ছি তোমার কাছে। তা তুমি সে কথা বলছ না, আজে-বাজে তর্ক তুলছ। তবে আবার কি !

সুহাস : বন্ধুর বাড়ি appointment আছে বলছিল না, সব বানানো। আসলে বিকেল হলেই মেয়ের সে ছটফট ছটফট ভাব, দেখা তো করবি ছাই রঞ্জনের সঙ্গে।

রসময় : তা হলে তো Done. খুব ভালো কথা। মেয়ের temparament

তো আমি জানি। অত্যন্ত অভিমানিনী, ভীষণ sensative, একটা mental alliance যদি ইতিমধ্যে হয়ে থাকে তো খুবই ভালো বলতে হবে। I am happy Suhas.

সুহাস : তা হলে আমরাও একটু স্বস্তি পাই বাপু।

রসময় : যা হোক, রঞ্জনের বাবা নাকি মেয়ে দেখবেন শুনছিলাম।

সুহাস : হ্যাঁ, বলছিল তো কংশ। এখন কি করেন, কবে আসবেন, রাজারাজড়ার ব্যাপার।

রসময় : রঞ্জনের বাবার খেতাব আছে নাকি, রাজা বলছ?

সুহাস : বাঃ, কত বড়লোক। খেতাবেই কি শুধু রাজা হয়!

রসময় : ও, টাকাওলা। তাই বলো।

[ফোন বেজে ওঠে]

সুহাস : হ্যালো! কে? কে, কল্যাণী? ডেকে দিচ্ছি। [রসময়কে] মেয়ের ফোন। কল্লু! এখন থেকে খালি ফোন আসবে। তিষ্ঠুতে দেবে বাড়িতে? সত্যি ছেলেমেয়ের এই মন দেয়া-নেওয়া আমার এত ভালো লাগে!

রসময় : কে, রঞ্জন ফোন করছে বুঝি?

সুহাস : আস্তে বলতে পারো না কথা! তোমার যদি কোনো সাড় থাকে! অ কল্লু! কোথায় গেলো। [স্বামীকে] বেরিয়ে যেও ঘর থেকে মনে করে। কল্লু!

[স্বামী-স্ত্রী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে রসময় একটু বেশি দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। সুহাসের প্রস্থান।]

[দ্রুত কল্যাণীর প্রবেশ]

রসময় : কল্যাণী, তোমার টেলিফোন।

[দ্রুত প্রস্থান]

কল্যাণী : [ফোন তুলে] Yes, yes, h'm h'm. এই তো সাড়া দিচ্ছি।... একা একা! কেন, taste tube তো সঙ্গেই আছে। যেতে হবে? না, না। আমার কিন্তু বাড়িতে থাকবার কথা, জানো।... আচ্ছা আচ্ছা, এক্ষুনি আসছি, বাব্বাঃ!...এই ধরো পৌঁছে গেছি।

[আনন্দে আত্মহারা হয়ে গান গাইতে থাকে—বাণিজ্যেতে যাব, আমি যাব আমি যাব। তাড়াতাড়িতে প্রসাধনটা শেষ করে নেয়]

[সুহাসের প্রবেশ]

সুহাস : কি রে! আমি না তোকে বারণ করলুম আজ বাইরে যেতে।

কল্যাণী : মা, এই যাব আর আসব। একদম দেরি করব না। লক্ষ্মী মা, অমত করো না।

[রসময়ের প্রবেশ]

রসময় : কি, ব্যাপার কি?

সুহাস : দেখেছ মেয়ের কাণ্ড, বেরুতেই হবে বন্ধুর বাড়ি একবারটি।

রসময় : তুমিও রাজি হয়ে গেলে তো!

সুহাস : কি বলি বলো তো।

রসময় : [কল্যাণীকে] তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু মা।

কল্যাণী : হ্যাঁ বাবা।

[দ্রুত প্রস্থান]

সুহাস : দেখলে তো! রঞ্জন ফোন করলে...

রসময় : দেখলাম। আমার খুব ভালো লাগল সুহাস। খুব ভালো লাগল।

সুহাস : লাগবেই তো। লাগবে না! কত আনন্দের ব্যাপার!...কি দেখছ!

রসময় : দেখছি তোমাকে, আজ আবার নতুন করে। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে, তোমার মনে পড়ে সুহাস—!

সুহাস : সব মনে আছে।

রসময় : তোমাদের সেই আলিপুরের বাড়ি...

সুহাস : টেনিস-কোর্টের লনে সন্ধেবেলা সেই বেতের চেয়ার পেতে বসা...

রসময় : আর পাগলা সাহেবের সেই ঝড়ের মতো পিয়ানো বাজানো...!

[রঞ্জনের নেপথ্য কণ্ঠ : কল্যাণী! কল্যাণী! সচকিত হয়ে ওঠেন রসময় ও সুহাস]

[রঞ্জনের প্রবেশ]

রঞ্জন : কল্যাণী!

সুহাস : কে রঞ্জন!

রঞ্জন : কল্যাণী কোথায় মাসীমা?

সুহাস : কল্যাণী...[স্বামীর দিকে তাকান]...আচ্ছা, আমি দেখছি।

[রঞ্জনের দ্রুত প্রস্থান]

[রঞ্জনের নেপথ্য কণ্ঠ তখনও শোনা যায় : কল্যাণী, কল্যাণী, কল্যাণী—]

রসময় : তবে যে তুমি বলছিলে রঞ্জন টেলিফোন করছিল !

[হতবাক পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকেন]

পর্দা

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কাটা-জানালার ভেতর দিয়ে ল্যাবরেটরির একাংশ পরিদৃশ্যমান—কাঁচের জার, কাঁচের টিউব আর রবারের নলের মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। নীলচে আগুনে টেস্ট টিউবে কি একটা পরীক্ষা করছে অসীম। সন্তর্পণে কল্যাণী প্রবেশ করে। তার ছায়া গিয়ে পড়ে ল্যাবরেটরির ওপর।]

অসীম : এক্ষুনি আসছি, হুঁ:। আবার বলা হলো, ধরো পৌছে গিছি, —chuky মেয়ে! …সব চালাকি, সমস্ত মিথ্যে কথা, liar. …আরে বাবা এখান থেকে তো এখানে, তিন ফার্লং রাস্তা, এর ভেতরে তিনবার যাতায়াত হয়ে যায়—ঠিক আছে। হামভি দেখ লেগা।…এসো না, আজ টেরটি পাবে। অসীম সেনকে এখনও চেনো নি তুমি মেয়ে, [অনবধানতাহেতু টেস্ট টিউবটির পতন]—যা চ্চলে!

কল্যাণী : [এগিয়ে গিয়ে] তা অত ঝগড়া করলে যাবে না পড়ে ?

অসীম : ছি ছি, কি করলে বলো তো ?

কল্যাণী : বারে, আমার দোষ বুঝি !

অসীম : আলবাৎ, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়েই তো হলো ব্যাপারটা।

কল্যাণী : তা, তুমি যদি এখন বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে ঝগড়া করো!

অসীম : এই তুমি যদি খানিকটা আগে আসতে তো এ ঝগড়াও বাধত না, আমার টেস্ট টিউব-ও ভাঙ্গত না।

কল্যাণী : আগে মানে কত আগে অসীম! ফোন করবার দশ মিনিট-এর মধ্যেই তো এসে পড়েছি।

অসীম : আর ফোনই বা করতে হবে কেন রোজ রোজ। নিজে থেকে আসতে পারো না ?

কল্যাণী : বারে, কখন কোথায় থাকো…

অসীম : জেনে নেবে।

কল্যাণী : কি করে অসীম।

অসীম : গুণে।

কল্যাণী : মানে ?

অসীম : মানে ··

কল্যাণী : শুনি শুনি।

অসীম : জানি জানি।

কল্যাণী : কি ?

অসীম : কিচ্ছু না।

কল্যাণী : আচ্ছা কাল থেকে ঠিক আসব।

অসীম : মাফ করো। আজগের একটা finding-ও আমার corrct হয় নি।…আশ্চর্য, এমন একটা Vacuam-এর ভেতরে rut করছে মনটা, সকাল থেকে কি বলব স্রেফ তোমার কথা মনে হচ্ছে। ফানেল-এর ভেতরে তুমি, টেস্ট টিউবে তুমি, সব কিছু আড়াল করে আছ।

কল্যাণী : বিজ্ঞানী-তুমি যে কবি হয়ে উঠলে অসীম !

অসীম : তবে একটা কথা আমার সত্যিই মনে হয় কল্যাণী কি জানো, perhaps this Atom, অর্থাৎ পরমাণু, যেটা আমার research-এর বিষয়বস্তু, this atom can only be harnessed by poetry, love, an unbounding love for every quintessence of dust. সত্যি কল্যাণী, ভালোবাসা, প্রেম—কথাগুলো শুনেই এসেছি এতদিন, বুঝতে পারি নি। কি জানো, পুরুষ, পুরুষ যদি হয় পরমাণু, তবে তুমি-প্রকৃতি আমাকে বিদীর্ণ করতে পারো মহত্তর কোনো কল্যাণের খাতিরে—only a woman's love. কি জানি এমনি সব এলোমেলো কথার ঝড়-

তুফান তুলে আনো তুমি আমার মনে আর আমি খড়কুটোর মতো দিশেহারা হয়ে যাই। তুমি কথা বলছ না কেন ?

কল্যাণী : তুমি তো জানো অসীম, দর্শন শাস্ত্রের ছাত্রী ছিলাম আমি। বিজ্ঞানীর কোনো জ্ঞানই নেই আমার। বস্তু নিরপেক্ষ তত্ত্বর কথা যা জানি, তা তোমার ভালো লাগবে না।

অসীম : তত্ত্ব নিরপেক্ষ বস্তু নেই, আবার বস্তু নিরপেক্ষ তত্ত্ব-ও হতে পারে না, এই তো তোমার আমার সকলের আশার কথা কল্যাণী। তোমাকে বাদ দিয়ে আমি, বা আমি নেই শুধু এক তুমি, আমি ভাবতে পারি না কল্যাণী।

কল্যাণী : আমি-ও পারি না অসীম। তবে কি জানো, ভয় হয় পাছে তোমাকে এতটুকু খর্ব করি। ভালোবেসে শেষটায়···

অসীম : এ তোমার এড়াবার প্রশ্ন কল্যাণী। দুঃখ বিনা সুখ, সে সুখ—হ্যাঁ ঝুঁকি আছে। ঝুঁকি নিতে হবে।

কল্যাণী : তুমি আমাকে অভয় দাও।

অসীম : কিন্তু আগে চাই বরাভয়, তুমি 'কল্যাণী'। বাবাকে কথাটা বলেছ ?

কল্যাণী : না।

অসীম : কেন ?

কল্যাণী : আজ বলব।

অসীম : হ্যাঁ, যে কথা বলতেই হবে···

কল্যাণী : বলতেই হবে, না ?

অসীম : নিশ্চয়। তোমার মনোরঞ্জন করতে পারবে এক এই অসীম সেন, এই বলে দিলাম। কোনো রঞ্জন রায়ের এতটুকু scope নেই সেখানে।

কল্যাণী : আচ্ছা আচ্ছা, বাব্বাঃ! আচ্ছা অসীম!

অসীম : চলো গল্প করতে করতে এগিয়ে যাওয়া যাক।

কল্যাণী : তাই চলো। দেখেছ !

অসীম : কি হলো ?

কল্যাণী : তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরবার কথা ছিল আমার, ভুলেই গেছি।

অসীম : ওটা আপেক্ষিক। আবার কত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা যায়!

কল্যাণী : আচ্ছা তুমিই বলো তো!

অসীম : আর বলো কেন! বাবাকে বলো, প্রফেসর ঠিক বুঝবেন।

কল্যাণী : বলব।

অসীম : না, আজই বলো।

কল্যাণী : আচ্ছা আজই। আজই বলব।

অসীম : চলো।

কল্যাণী : চলো।

পর্দা

[ক্রমশঃ

অস্ট্রিয়ার শুল্ক-কর্তৃপক্ষ

জারোস্লাভ হাসেক

ড্রেসডেনের কাছে ভ্রমণকালে আমি এক দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম। যখন পদব্রজে সেখানে বিচরণ করছিলাম তখন হঠাৎ একটি এক্সপ্রেস ট্রেন আমাকে চাপা দিয়ে চলে যায় এবং এমন সুনিপুণ কৌশলে আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে যে ডাক্তারদের দেড় বছর সময় লেগেছিল আমাকে আবার জোড়া লাগাতে। এই দুর্ঘটনার আগে আমি ঠিক করেছিলাম চারদিনের মধ্যে প্রাগে ফিরে আসব কিন্তু চারদিন ছেড়ে আঠারো মাস লেগেছিল ড্রেসডেন থেকে ফিরতে।

আমি জানি মানুষ মাত্রেই ভগবানের হাতের পুতুল, কিন্তু আমি আবার চিকিৎসকদের হাতের পুতুলও হয়েছিলাম।

আমি একটি ভয়ানক দৃশ্য দেখেছিলাম। এখনও জানিনা এবং কখনও জানতে পারিনি আমার দেহের কোন কোন অঙ্গ একান্তই আমার নিজের! শুধু এইটুকু জানি আমাকে আবার খাড়া করতে আঠারোজন ডাক্তার ও তাঁদের বাহান্নজন সহকারী লেগেছিল। তাঁরা একাজে বিলক্ষণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সবশেষে আমাকে একটি ছাড়পত্র দেওয়া হয়। তাতে আমাকে আবার মানুষ নামে জীবে পরিণত করার জন্যে কি কি উপাদান ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এখন আমার শরীরে কি কি মালমশলা আছে তার একটি হিসেবও লিখে দেওয়া হয়। এই দলিলখানি আমাকে সারাজীবন পঙ্গু হয়ে থাকবার অধিকার দিল। আমার শারীরিক অবস্থার বর্ণনা লিখতে ডাক্তারের এই চোদ্দ পাতার দলিলটি তৈরি করতে হয়েছিল।

মস্তিকের কিছুটা অংশ, একখণ্ড পাকস্থলী, প্রায় পনেরো কিলোগ্রাম মাংস এবং অর্ধ লিটার রক্ত ছাড়া আমার নিজের বলতে কিছু ছিল না। বাদবাকি আর সব মোটেই আমার নিজস্ব নয়, কেবল ফুসফুস ছাড়া—তাও অংশত, বাকি যেটুকু হারিয়ে গিয়েছিল ষাঁড়ের ফুসফুস দিয়ে সেটুকু পূরণ করা হয়েছিল।

চিকিৎসা বিজ্ঞান তখন উন্নতির উচ্চ শিখরে। তারই নিচে আমি—সম্পূর্ণ

কৃত্রিম হাতে-গড়া একটি মানুষ। সার্টিফিকেটেও একথা লেখা ছিল। আমি জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হয়েছিলাম। আমাকে দিয়ে প্রমাণ হয়েছিল যে চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্বারা নানারকম খণ্ড খণ্ড উপাদান দিয়ে একটি নতুন মানুষ তৈরি করা সম্ভব, যেমন শিশুরা ছোট ছোট পাথর ও কাঠ দিয়ে একটি প্রাসাদ তৈরি করতে পারে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই আমার প্রথম কাজ হলো একবার এখানকার কবরখানায় ঘুরে আসা, কেননা আমার ভীষণ ইচ্ছে হলো সেই জায়গাটা দেখবার জন্যে যেখানে আমার শরীরের বাতিল অংশগুলো কবর দেওয়া হয়েছিল। হাসপাতাল থেকে আগত মৃতদেহগুলো যেখানে থাকে সেখানে একটা আলাদা জায়গায় আমার অংশগুলি রাখা হয়েছিল। তারপর ওখান থেকে প্রাগে ফেরার জন্য সোজা রেলস্টেশনের দিকে চলে গেলাম। আমি জানতাম এই সুন্দর শহরে কখনও বেড়াতে এসেছে এইরকম যে কোনো ভ্রমণকারীর চেয়ে আমিই বোধহয় ড্রেসডেনে বেশিদিন থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম।

Dećin-এ অষ্ট্রিয়ার শুল্ক বিভাগের কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের মালপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করত। তারা আমাদের মালপত্র টানাটানি করে খুলতে লাগল এবং কিছুক্ষণের জন্যে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করল। তারপর কর্তৃপক্ষের একজন আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে হাসল এবং একদৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল। একজন জোড়াতালি লাগানো লোকের অদ্ভুত চেহারা সম্ভবত তার মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। বস্তুত কোনো মানুষের পক্ষে আমার মতন তাকানো মানে—সে নিশ্চয় নিদেনপক্ষে স্যাকারিনের চোরাকারবারী! আমাকে বেশ পাকা উত্তম মধ্যম খাওয়া চোরাকারবারীর মতোই দেখাচ্ছিল।

অফিসার আদেশ করল: "তোমার পোঁটলা নিয়ে আমার পেছনে পেছনে অফিসের দিকে এসো।"

সেখানে তারা আমার পোঁটলা খুলল। এবং ভালো করে অনুসন্ধানকার্য চালাল। কিন্তু সন্দেহ করার মতন কিছুই খুঁজে পেল না। পরক্ষণেই হঠাৎ পোঁটলার নিচে কিছু কাগজপত্র তাদের দৃষ্টিগোচর হলো। এর মধ্যে ড্রেসডেন হাসপাতাল থেকে পাওয়া আঠারোজন ডাক্তার ও তাদের বাহান্নজন সহকারীর স্বাক্ষর করা সার্টিফিকেটখানাও ছিল।

: "হায় ভগবান!" তারা সার্টিফিকেটখানা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল: "তোমাকে ওপরে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। এই অবস্থায় আমরা তোমাকে অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করতে দিতে পারি না।"

ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি অত্যন্ত সম্মানীয় ভদ্রলোক ছিলেন, যিনি শত ক্লেশ সত্ত্বেও স্বীয় কর্তব্যের প্রতি অবিচলিত। আমার সার্টিফিকেটখানা পরীক্ষা করার পর বললেন: "প্রথমত এই দলিলানুসারে তোমার মাথার খুলির পেছন দিকটা রৌপ্যপাত দিয়ে পূরণ করা হয়েছে। এই পাতে কোনোরকম অবশ্য প্রয়োজনীয় ছাপ নেই, সেইজন্যে বারো ক্রাউন জরিমানা দিতে হবে। তোমার মাথার খুলিতে একশো কুড়ি গ্রাম রুপো আছে। কোনো অবশ্য প্রয়োজনীয় ছাপ নেই জানা সত্ত্বেও উপযুক্ত শুল্ক ফাঁকি দিয়ে তুমি সীমানা অতিক্রম করতে যাচ্ছিলে, এরদ্বারা তুমি পণ্য আমদানী রপ্তানীর ৯৩৬ নম্বর আইনের ৬ ও ৮বি ধারা লঙ্ঘন করেছ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তোমাকে তিনগুণ জরিমানা অর্থাৎ ১২ ক্রাউনের তিনগুণ বা ৩৬ ক্রাউন সর্বসমেত দিতে হবে। তাছাড়া ১৯০২ সালের রৌপ্যকর সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বি. এফ. ও জি ধারার যে সংশোধন হয়েছিল সেইমতে প্রতি গ্রামে ১০ হেলার ধার্য করা হয়েছে। তাহলে অতিরিক্ত আরও ১২ ক্রাউন আসছে। শুধু তাই নয়—তোমার বাঁ পায়ের উরুতে ঘোড়ার হাড় লাগানো হয়েছে। এটাকেও আমরা—অস্থি-সংবাদ গোপন করে সীমানা অতিক্রম করা হিসেবে ধরব। বুঝতে পেরেছ, বন্ধু, এইভাবে তুমি অষ্ট্রিয়ার হাড়ের ব্যবসায় পেছন থেকে ছুরি মেরেছ। এইভাবে ঘোড়ার হাড় লুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণ কি এবং কেন? হাঁটতে পারবে বলে—এঁ্যা—তাহলে আমাদের খাতায় লিখতেই হবে যে তোমার ব্যবসা চালাবার জন্যে ঘোড়ার হাড় ব্যবহার করেছ। একেবারে নিজের সম্পত্তি করে ফেলেছ—এঁ্যা—জবর বন্ধু আমার—

"বলতে খুবই ভালো শোনায় যে তোমার ব্যবসা চালাবার জন্যে এটা দরকার কিন্তু তারজন্যে এখন তোমাকে মূল্য দিতে হবে। কারণ যখন জীবজন্তুর হাড় ইচ্ছাকৃতভাবে লুকিয়ে অস্ট্রিয়াতে আনা হয় তখন তার ওপর আমাদের পণ্যশুল্কের তালিকা খুব কড়া হয়।

"তোমার রিপোর্টে এখনও আরও একটি অংশ আছে। তোমার পাঁজরার তিনটে হাড় প্ল্যাটিনামের তার দিয়ে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। হা ঈশ্বর—তুমি কি অস্ট্রিয়াতে অবৈধভাবে প্ল্যাটিনাম আমদানী করছ? জানো এর পরিণাম কি—

"তিন শতগুণ জরিমানা—তিনটে তারের ওজন ২০ গ্রাম। জরিমানা দাঁড়াচ্ছে ১৬০০ ক্রাউন। এইরকম কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্যে তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত।

"কিন্তু—এখানে আবার কি দেখছি—

"এই সার্টিফিকেট যা বলছে তোমার কিডনির এক অংশ—মানে বাঁ দিকেরটাতে শূকরের কিডনি ব্যবহার করা হয়েছে—

"মানিক!—শূকরের মাংস অস্ট্রিয়াতে আমদানী একেবারে নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধকরণ শূকরের মাংসের অংশ-বিশেষের ওপরও প্রযোজ্য। এবং যেহেতু তুমি বোহেমিয়ায় যেতে চাও সেহেতু তোমার কিডনিটাকে জার্মানীতে রেখে যেতে হবে।"

যেহেতু আমি আমার কিডনি স্থানচ্যুত করতে সম্মত হইনি সেইজন্যে গত দশ বৎসর যাবৎ স্যাক্সনিতে পড়ে রয়েছি এবং এগ্রারিয়ান পার্টির দিকে মুখ চেয়ে বসে আছি—অস্ট্রিয়াতে শূকরের মাংস আমদানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্যে। কারণ আমিও সেই দলমতে বিশ্বাসী। তারপর—আমি দেশে ফিরে যাব।

চেক্ গল্পকার Jaroslav Hac´ek রচিত কয়েকটি গল্পের ইংরিজি অনুবাদ-সঙ্কলন 'Tourist Guide' গ্রন্থের 'Austrian Customs Authorities' গল্পটির বাংলা ভাষান্তর করেছেন: প্রভাস বসু

লেনিন শান্তি পুরস্কার

শান্তি—এই শব্দটি আজ পৃথিবীর নানা দেশে নানা ভাষায় উচ্চারিত হচ্ছে কোটি মানুষের কণ্ঠে। এই শান্তির জন্য এই শতাব্দীর মানুষের মতো আকাঙ্ক্ষা আর কে করেছে? কারণ, শান্তির নামে চলেছে যুদ্ধের চক্রান্ত, শক্তিমানরা শক্তির ভয় দেখিয়ে শান্তি নামক বস্তুটিকে নিজেদের মনোপলি করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছে এই শতাব্দীর মানুষ। সেই সর্বনাশা আগুনে মানুষের ঘর পুড়েছে, প্রিয়জনের ঘটেছে মৃত্যু। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সমাধির ওপর ডিক্টেটররা নিজেদের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফাসিস্তদের বিনাশের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন আর পশ্চিমী মিত্রশক্তি এক মহামৈত্রীতে আবদ্ধ হয়েছিল। সোভিয়েতের মানুষ সেই মৈত্রীকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণ দিয়েছে—ফাসিজমের সমাধি রচিত হয়েছিল স্তালিনগ্রাদে, শ্রমজীবী মানুষের লাল পতাকা উড়েছিল কুখ্যাত রাইখস্ট্যাগে। কিন্তু যুদ্ধের পর মিত্রশক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় সেই মহামৈত্রী অতলান্তিকের অতল জলে নিক্ষিপ্ত হলো। চার্চিল তাঁর কুখ্যাত 'ফুলটন বক্তৃতায়' ঘোষণা করলেন কমিউনিজমের বিরুদ্ধে নূতন জেহাদ। স্নায়ু যুদ্ধের সূত্রপাত করলেন এই জঙ্গীবাদী রাজনীতিবিদ, যিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে বার্লিন পতনের পর ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমেরীকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন লালফৌজ আরও এগিয়ে এলে যেন তাদের প্রতিরোধ করা হয়। লালফৌজ আর এগোয় নি। কারণ সাম্রাজ্যবিস্তারের বাসনা নিয়ে তারা যুদ্ধে নামে নি, নেমেছিল ফাসিজমের হাত থেকে মানবজাতিকে, পৃথিবীর শান্তি ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য। সেই শান্তির নামে সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে। প্রতি বৎসর পৃথিবীর শান্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। এই শান্তি পুরস্কার এখন মহামতি লেনিনের নামে উৎসর্গীকৃত। ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত এই দুর্লভ সম্মান পেয়েছেন তিনজন: সৈফুদ্দিন কিচলু, মেজর জেনারেল সাহেব সিং শোখে এবং শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু। এবারে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বিশ্বের পাঁচজন রাষ্ট্রনেতা, কবি ও শিল্পীকে।

ঘানার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ কোয়ামে এন্‌ক্রুমা, বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী পাবলো পিকাসো, পাকিস্তানের কবি ও সংবাদিক ফয়েজ আহ্‌মেদ ফয়েজ, হাঙ্গারীর রাষ্ট্রপ্রধান ও জননেতা ইস্তভান দোবি ও চিলির জননেতা অলগা পাবলেভো ডি এসপিনোজা এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এশিয়া, আফ্রিকা, ইওরোপ ও লাতিন আমেরিকার এই পাঁচজন মানুষ নিজেদের কর্মক্ষেত্রেই শুধু শ্রুতকীর্তি নন, মানবতার জন্য এঁদের অক্লান্ত সংগ্রাম, শান্তিস্থাপনে অনলস আগ্রহ বিশ্বমৈত্রীকে দৃঢ়তর করেছে। আন্তর্জাতিক লেনিন শান্তি পুরস্কার সেই সংগ্রামেরই স্বীকৃতি। পিকাসো ও ফয়েজ আহ্‌মেদ ফয়েজের সঙ্গে পৃথিবীর সংস্কৃতিকামী মানুষের পরিচয় ঘনিষ্ঠ। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ডিক্টেটর ফ্রাঙ্কোর সহযোগী হিটলারের বিমানবাহিনী কর্তৃক মুক্তনগরী গুয়ের্নিকার ভয়াবহ ধ্বংসলীলাকে চিত্রিত করেছিলেন মানবপ্রেমিক মহান শিল্পী পাবলো পিকাসো। বিশ্বশান্তি আন্দোলনের প্রতীক জলপাই পাতা মুখে শ্বেত পারাবত পিকাসোর সৃষ্টি। পিকাসো এযুগের বিস্ময়, তিনি সর্বকালের বিস্ময়। কবি ফয়েজ আহ্‌মেদ ফয়েজ উর্দু কবি, লাহোরের 'পাকিস্তান টাইমস্' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন তিনি। পাকিস্তানের গণ-আন্দোলনের পুরোগামী সৈনিক। বহু লাঞ্ছনা আর নির্যাতন তিনি সহ্য করেছেন। কিন্তু মানুষের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারান নি। তাঁর কবিতায় তিনি মুক্ত মানবতার, গণতন্ত্রের ও শান্তির জয়গান করেছেন। ফয়েজের এই সম্মান পাক-ভারত উপমহাদেশের গণতান্ত্রিক মানুষের সম্মান। লেনিনের নামাঙ্কিত এই পুরস্কার বিশ্বে শান্তি আন্দোলনকে শক্তিশালী করে পৃথিবীর মানুষের মনে জাগিয়েছে নতুন আশা!

চ্যাপলিনের সম্মান

আগের সংখ্যাতেই আমার উল্লেখ করা উচিত ছিল—চার্লস চ্যাপলিনকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যে ডক্টরেট ডিগ্রি দিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চ্যাপলিনের এই সম্মান তাঁর শিল্পের স্বীকৃতি। চলচ্চিত্রে তিনি যে শিল্প-প্রয়োগ করেছেন, সাহিত্য ও জীবনবোধের সংজ্ঞাতে তা উজ্জ্বল। তিনি নিছক এণ্টারটেনমেণ্টের জন্য চলচ্চিত্র সৃষ্টি করেন নি, চলচ্চিত্রকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন শিল্পসৃষ্টির জন্য এবং তাঁর শিল্পের উদ্দেশ্য শোষণহীন সমাজ ও মানবতার জয়। দীর্ঘজীবনের শিল্পসাধনায় চ্যাপলিন একনিষ্ঠভাবে

শোষিত, দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন, গণতন্ত্রের সপক্ষে ফাসিজমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের কণ্ঠ মিলিয়েছেন পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে। নিজে দরিদ্র ছিলেন বলেই দারিদ্র্যের অভিশাপে জীবনের বিবর্ণতা তিনি কোনোদিন বিস্মৃত হন নি। 'যারা মানুষকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয় তাদের তিনি কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেন নি। চ্যাপলিন সত্যদর্শী শিল্পীর অন্তর্চক্ষু দিয়ে সমাজের অন্যায়-অবিচারকে মহত্তম শিল্পের ব্যঞ্জনায় রূপায়িত করেছেন তাঁর চলচ্চিত্রে। তিনি জীবন থেকেই সংগ্রহ করেছেন তাঁর এই আশ্চর্য সাহিত্যের উপকরণ। রাজনীতিক ছুঁৎমার্গীরা চ্যাপলিনকে সন্দেহের চোখে দেখেছে, যেমন দেখেছিল এ্যাডলফ হিটলার, দেখেছিল জো ম্যাক্‌কার্থি। কিন্তু তিনি অকুতোভয় শিল্পীর মতোই এদের কাছে কোনোদিন মাথা নত করেন নি, আপোস করেন নি তাঁর শিল্পসত্যের সঙ্গে রাজনীতিক ডাইনী-তাড়ুয়াদের নির্দেশনামার। যুদ্ধের সময়ে তিনি হলিউডে জনসভা সংগঠন করেছিলেন সেকেণ্ড ফ্রন্ট খোলার জন্য; সোভিয়েত-সুহৃদ চার্লস চ্যাপলিনকে সে কারণেই ম্যাক্‌কার্থির আমেরিকা ক্ষমা করতে পারে নি। তিনি হলিউড ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হন—এখন তিনি সুইজারল্যাণ্ডে। বৃটেনেও এক শ্রেণীর রাজনীতিক চ্যাপলিনের এই সম্মাননায় খুশি হতে পারেন নি। তাঁরা চ্যাপলিনকে রাজকীয় খেতাব দেবার পক্ষপাতী, সাহিত্যের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত। কিন্তু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই কলরবে পিছিয়ে যায় নি—বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় এযুগের শ্রেষ্ঠতম শিল্পীকে এই স্বীকৃতি দিয়ে নিজেই গৌরবভাগী হবে। চ্যাপলিন শিল্পীসমাজের গৌরব।

'প্রাভদা'র জয়ন্তী উৎসব

বিশ্বের প্রথম সর্বহারাদের রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র 'প্রাভদা'র পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হলো। ১৯১২ সালের ৫ই মে তারিখে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে (এখন যার নাম লেনিনগ্রাদ) 'প্রাভদা'র প্রথম আত্মপ্রকাশ। এই অর্ধশতাব্দী ধরে 'প্রাভদা' বিপ্লবের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত রেখেছে। 'প্রাভদা'র জন্মদিন থেকেই এর প্রধান সম্পাদক ও প্রধান লেখক ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। জারের আমলে 'প্রাভদা'কে বহুবার নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। ১৯১৩ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে একবছরেই

দুশোবার এর বিরুদ্ধে জারের পরোয়ানা জারি হয়েছে। প্রত্যেকবারই নাম বদল করে 'প্রাভদা' বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষে অত্যাচারী জারতন্ত্রের ভিত্তি কাঁপিয়েছে। বহুবার 'প্রাভদা'র সম্পাদককে কারাবরণ করতে হয়েছে। ১৯১৭ সালের ৮ই নভেম্বর 'রারোচি পুট' ('প্রাভদা'র বহু নামের একটি) মহান অক্টোবর বিপ্লবের জয় ঘোষণা করে। পরদিন থেকেই আবার 'প্রাভদা' নামে তার আত্মপ্রকাশ। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সংবাদপত্রের সঙ্গে 'প্রাভদা'র চেহারায়, চরিত্রে ও সংবাদপরিবেশনে বিপুল পার্থক্য। চাঞ্চল্যকর শিরোনামা নেই, হত্যাকাণ্ডের সংবাদ নেই, শেয়ার বাজারের স্পেকুলেশন নেই এবং স্বল্পবসনা নারীদেহের চিত্রসম্বলিত পণ্যের বিজ্ঞাপনও তাতে পাঠকরা খুঁজে পাবেন না। কিন্তু এর পরিবর্তে 'প্রাভদা'য় এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সংবাদপত্রে শ্রমজীবী, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মী মানুষের কর্মকাণ্ডের সংবাদ সশ্রদ্ধায় প্রকাশিত হয়। 'প্রাভদা'র বৈশিষ্ট্য এখানেই। সাম্রাজ্যবাদীরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে জন্মলগ্নেই কণ্ঠরোধ করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। সে ষড়যন্ত্রে তারা ব্যর্থ হয়েছে। সমাজতন্ত্রের বাণী বহন করে 'প্রাভদা'র পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি নিপীড়িত, শোষিত মানুষের জয়যাত্রার একটি উজ্জ্বল প্রতীকরূপেই গণ্য।

হোয়াইট হাউস-এ বুদ্ধিজীবী

আমেরিকার তরুণ প্রেসিডেণ্ট জন কেনেডি নতুনত্বের চমক আনতে চান। আমেরিকার মানুষ আশা করেছিল কেনেডির বয়স অল্প, রাজনীতিতে এতটা পাকা-পোক্ত হন নি। নতুন যুবক নতুন পথেই হয়তো আমেরিকাকে নিয়ে যাবেন। দেখা গেল যুবকটির টিকি ওয়াল স্ট্রীটেই বাঁধা আছে। কিউবার সমুদ্রোপকূলে নাকানি-চোবানি খেয়ে এতদিনে কেনেডি বোধহয় খানিকটা সামলে নিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমেরিকার নোবেল পুরস্কারবিজয়ী শিল্পী, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের। যাঁরা লোকান্তরিত তাঁদের পত্নীদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল এই বিশেষ সাম্মানিক অনুষ্ঠানে। ডাঃ ওপেনহাইমার, ডাঃ লাইনাস পলিং, শ্রীমতী পার্লবাক, শ্রীমতী হেমিংওয়ে প্রমুখ পঞ্চাশজন নোবেল পুরস্কারবিজয়ী আমেরিকান বুদ্ধিজীবী এবং তাঁদের প্রতিনিধি হোয়াইট হাউসে গিয়ে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। কোনো উপদেশ বর্ষণের

জন্য তিনি তাঁদের ডাকেন নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে কেবল ধনকুবেরদের কথাতেই চলেন না, বুদ্ধিজীবীদের প্রতিও যে তাঁর মনোযোগ রয়েছে, এ আমন্ত্রণের পেছনে কেনেডির এমন অভিলাষই কাজ করেছে। তবু ভালো, হোয়াইট হাউসে এতদিন পর মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের পদার্পণ ঘটল। যদিচ একথা সর্বজনবিদিত যে মার্কিন রাজনীতিতে কিংবা সমাজজীবনে বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব সামান্য। তাঁদের বক্তব্য কাগজে ছাপা হয় না, অর্থাৎ এমন বক্তব্য যা সরকারের নীতির বিরোধী। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরাই সেখানকার সর্বেসর্বা। কে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, কী বিষয়ে, সাধারণ মার্কিনী তার খবর রাখে না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নোবেল পুরস্কারবিজয়ীদের এই সম্মান দিয়ে একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তই স্থাপন করলেন!

মম-এর চিত্রসংগ্রহ

সমারসেট মম তাঁর সারাজীবনে শুধু খ্যাতি, অর্থ ও জনপ্রিয়তাই অর্জন করেন নি। আটাশী বছরের জীবনে তিনি সঞ্চয় করেছেন কতকগুলি সম্পদ, যা দুর্লভ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা দুষ্প্রাপ্য চিত্রাবলী তিনি সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। মম তাঁর বইয়ের রয়্যালটির টাকা গচ্ছিত করে রেখে যাচ্ছেন উত্তরকালের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের জন্য এবং তার সঙ্গে যোগ করে দিয়ে গেলেন এই দুর্লভ চিত্রাবলী থেকে প্রাপ্ত অর্থ। মাঁরি মাতিস, তুলুস-লত্রক, পিকাসো, রেনোয়া প্রভৃতি উজ্জ্বলতম শিল্পীদের স্বাক্ষরিত এই চিত্রভাণ্ডার তিনি নীলামে বিক্রি করেছেন। এই আশ্চর্য নীলামে অর্থ সংগৃহীত হয়েছে ৫২৩,৮৮০ স্টার্লিং। তরুণ সাহিত্যিক ও শিল্পীদের জীবনসংগ্রামে সাহায্য করার জন্য মম যে অর্থভাণ্ডার তৈরি করেছেন তা পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যিকদের পক্ষেও অনুকরণীয়। মম-এর সাহিত্যকীর্তি হয়তো শ্রেষ্ঠতমদের মধ্যে গণ্য হবে না। হয়তো তিনি জনপ্রিয় লেখক হিসেবেই পরিচিত থাকবেন। কিন্তু তাঁর এই সাহিত্যিক-দান নিশ্চয়ই একটি উল্লেখযোগ্য ও অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

অরুণ দেব

সমুদ্র : তথ্য ও তাৎপর্য

"ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র! উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখন এমত প্রচণ্ড বায়ু বহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে।"

সমুদ্রের এই বর্ণনাটি নেওয়া হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় অবশ্য সমুদ্রের বর্ণনা আরো আছে। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন, কালিদাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলের লেখা থেকেই সমুদ্রের কিছু না কিছু বর্ণনা নিশ্চয়ই উদ্ধার করা চলে। সমুদ্র দেখে উদ্বেলিত হননি এমন মানুষ খুব সম্ভবত নেই। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণাল বলছে: "তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।" সমুদ্র এতই বিপুল, এতই মহান, এতই গম্ভীর, এতই উচ্ছল যে সমুদ্রকে দেখে মানুষ যেমন আত্মহারা হয় তেমনি আত্মসচেতনও হয়ে ওঠে। সত্যজিৎ রায়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার চরিত্রগুলিকে যদি সমুদ্রের পটভূমিতে দাঁড় করানো যেত তাহলেও গল্পের মূল সুর (আমি যতোটুকু বুঝেছি) ক্ষুণ্ণ হতো না বলে আমার বিশ্বাস। সমুদ্র অতুলনীয়। সমুদ্রের তুলনা একমাত্র সমুদ্রই।

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সমুদ্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল 'সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণ' ও 'সমুদ্র-তরঙ্গ'।

স্বভাবতই বিজ্ঞানীরাও সমুদ্র সম্পর্কে চিরকালই অতিমাত্রায় কৌতূহলী ও অনিসন্ধিৎসু। বিজ্ঞানীদের আরো বিশেষ আগ্রহের কারণ এই যে সমুদ্র ছিল ও আছে বলেই আমরা আছি। সমুদ্রকে বলা চলে প্রাণের আদি জননী। আজ থেকে দু-শো কোটি বছরেরও আগে পৃথিবীর আদি সমুদ্রে আদি প্রাণের সূত্রপাত হয়েছিল। রুশ বিজ্ঞানী ওপারিনের এ-বিষয়ে বিশেষ গবেষণা আছে। প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশের প্রত্যেকটি পর্বকে তিনি নিভুল-

ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এবং জড় থেকে প্রাণের বিবর্তনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থিত করেছেন।

কিন্তু তবুও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ১৯২০ সালের আগে পর্যন্ত গভীর সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোনো ধারণাই ছিল না। অবশ্যই ধারণা না থাকার কারণ বিজ্ঞানীদের নিষ্ক্রিয়তা নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি তখনো পর্যন্ত এমন পদ্ধতির সন্ধান দিতে পারেনি যার সাহায্যে সমুদ্রের তলদেশে বৈজ্ঞানিক অভিযান চালানো যেতে পারত। শব্দতরঙ্গের সাহায্যে সমুদ্রের তলদেশের হদিশ নিতে পারাটা পরবর্তীকালের আবিষ্কার।

অথচ সমুদ্রকে খুঁটিয়ে না জানা পর্যন্ত এই পৃথিবীও আমাদের কাছে অনেকাংশে অপরিচিত থেকে যেতে বাধ্য। পৃথিবীর বাইরের দিকের চেহারাটা কী? তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। অবশ্য এটা নিতান্তই মোটামুটি হিসেব। অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে বলতে পারলে যথার্থ অনুপাত সম্পর্কে ধারণা হতে পারে। ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তন ৫১ কোটি বর্গ কিলোমিটার। জলভাগের আয়তন ৩৬·১ কোটি বর্গ কিলোমিটার বা মোট আয়তনের শতকরা ৭০·৮ ভাগ। বাকি শতকরা ২৯·২ ভাগ স্থল। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে স্থলভাগের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশের চেয়েও অনেক কম।

সমুদ্র সম্পর্কে আরো একটা লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে যদিও সমুদ্রের এক-একটি বিশেষ এলাকাকে আমরা আলাদা আলাদা নাম দিয়েছি কিন্তু সমুদ্র অখণ্ড—উত্তরে-দক্ষিণে পুবে-পশ্চিমে বিস্তৃত এক বিপুল জলরাশি। নিতান্তই ভৌগোলিক সুবিধের জন্যে আমরা কোথাও এর নাম দিয়েছি মহাসাগর, কোথাও সাগর, কোথাও উপসাগর, ইত্যাদি। মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তিনটি অতিকায় বাহুর মতো তিনটি মহাসাগর এই পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে—প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর। তাছাড়া আছে পৃথিবীর দুই মেরুদেশের দুটি মহাসাগর—উত্তর ও দক্ষিণ।

সমুদ্রের মোট জলের পরিমাণ ১৩৭ কোটি ঘন কিলোমিটার। এ-থেকে সমুদ্রের গভীরতা সম্পর্কেও খানিকটা ধারণা হতে পারে। সমুদ্র যদি সব-জায়গায় সমান গভীর হতো তাহলে এই গভীরতা হতো ৩৮০০ মিটার। কিন্তু

সমুদ্রের গভীরতা সবজায়গায় সমান নয়—মোটামুটি হিসেবে বলা চলে তিন হাজার থেকে ছ-হাজার মিটারের মধ্যে।

হালের গবেষণায় আরো একটি আশ্চর্য ব্যাপার জানা গিয়েছে। গভীর সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে অজস্র পর্বতমালা। এই পর্বতমালার একটি শাখাকে পাওয়া যায় আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝ-বরাবর। এই শাখাটি দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে ভারত মহাসাগরে এসে দুটি উপসাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি উপশাখা চলে গিয়েছে লোহিত সাগরের মুখ পর্যন্ত। অন্যটি অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ ঘেঁষে শেষ পর্যন্ত এসে মিশেছে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে। হাওয়াই দ্বীপের কাছে এই পর্বতমালার কোনো কোনো শিখর এমন কি মাউণ্ট এভারেস্টের চেয়েও উঁচু। আর পর্বতমালা থাকলে গহ্বর থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। সব মিলিয়ে গভীর সমুদ্রের তলদেশ আমাদের চোখের দেখার ভূপৃষ্ঠের চেয়েও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

আর সমুদ্রের জল সবসময়েই আলোড়িত, আবর্তিত ও বিক্ষুব্ধ। ঝড়-বাতাস, পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন, বিভিন্ন স্তরে সমুদ্রজলে ঘনত্বের পার্থক্য এবং জোয়ার-ভাঁটা—সব মিলে সমুদ্রে নানা বিভিন্নমুখী স্রোতোধারার সৃষ্টি হয়ে থাকে। সমুদ্রের উপকূল-ভাগে বড় রকমের ধ্বস নামার ফলেও সমুদ্রের তলদেশ বহুদূর পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠার কারণ ঘটে। ধ্বস নামা মানেই অনেকখানি পরিমাণে ঘোলা জল সৃষ্টি হওয়া। ঘোলা জল পরিষ্কার জলের চেয়ে ভারী। কাজেই ঘোলা জল নিচে নামে ও মাটি ও কাদার সংস্পর্শে এসে আরো বেশি ঘোলাটে হয়ে ওঠে। তারপরে এই ঘোলা জল পর্বতের চুড়ো থেকে হিমবাহের নেমে আসার মতোই গভীর সমুদ্রের দিকে নামতে শুরু করে। আর বেগও হয় প্রচণ্ড—মিনিটে এক থেকে দুই কিলোমিটার পর্যন্ত। এই ঘোলা জলের ধাক্কায় সমুদ্রের তলদেশের কেব্‌ল্ ছিঁড়ে যাওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এমনি আরো নানা কারণে সমুদ্রের তলদেশের শান্তি-ভঙ্গ হয়ে থাকে। অবশ্য শান্তি কথাটা ব্যবহার করা ভুল। সমুদ্র চির-অশান্ত।

অধ্যাপক জে-বি-এস হলডেন কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকায় সমুদ্র-অভিযান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটির শুরু এইভাবে: "আমাদের এই গ্রহের উপরিতলের সমগ্র স্থলভাগ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান মোটামুটি ভালোই। আর খুব সম্ভবত সমুদ্রের প্রায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারেই

কোনে না কোনো সময়ে কোনো না কোনো জাহাজ হাজির হতে পেরেছে। সুতরাং নতুন কোনো দ্বীপ বা চর আবিষ্কার হবার সম্ভাবনা না-থাকার মতো। কিন্তু তবুও সমুদ্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই কম।"

কথাটা অপ্রিয় হলেও পুরোপুরি সত্যি। আসলে সমুদ্র যদিও এতকাল আমাদের চোখের সামনেই ছিল কিন্তু সমুদ্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে ব্যাপকভাবে শুরু হতে পেরেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালেই। সমুদ্রকে বলা হয় 'ইনার স্পেস'—যেমন মহাকাশ হচ্ছে 'আউটার স্পেস'। এই 'ইনার স্পেস' এমন এক বিপুল রহস্যের এলাকা যে এ-সম্পর্কে জানার শেষ নেই। অথচ এখনো পর্যন্ত কতটুকু আমরা জানি? অধ্যাপক হলডেন বলছেন: "স্থলভাগের কোনো অঞ্চলে সারা বছরে গড়ে কী পরিমাণ বৃষ্টি হয়ে থাকে তার একটা মানচিত্র আমরা তৈরি করেছি। বাকি অংশ সম্পর্কেও আমরা মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারি সেই অংশে কী ধরনের উদ্ভিদ জন্মাচ্ছে—তা থেকে। কিন্তু সমুদ্রের এলাকায় বৃষ্টিপাত সম্পর্কে আমাদের কোনো হিসেবই নেই।"

ভাবলে অবাক হতে হয় যে মানুষ যে-সময়ে মহাকাশকে জয় করতে চলেছে তখনো সমুদ্র সম্পর্কে তার জ্ঞান কত সামান্য! অথচ, বিজ্ঞানীদের ধারণা, মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সমুদ্র সম্পর্কে তার জ্ঞানের ওপরে ও সমুদ্রের বিপুল সম্পদরাশিকে ভোগ্য করে তোলার ক্ষমতার ওপরে। সমুদ্রের সম্পদ বলতে শুধু সমুদ্রের মাছই নয়, সমুদ্রের জলের সঙ্গে দ্রবীভূত তাবৎ পদার্থভাণ্ডার। মেণ্ডেলিয়েফের তালিকায় যা কিছু পদার্থের নাম আছে সমস্তই কিছু না কিছু পরিমাণে সমুদ্রের জল থেকে পাওয়া যেতে পারে। এই পদার্থভাণ্ডারের চাবিকাঠিটি আয়ত্ত করতে পারলে মানুষের জীবনে যে কী প্রাচুর্য শুরু হবে তা কল্পনা করতে হলে শুধু এইটুকুই মনে রাখা দরকার যে আমরা এতকাল ভূপৃষ্ঠের শতকরা মাত্র ২৯.২ ভাগের সম্পদকে আংশিক-ভাবে আহরণ করতে পেরেছি।

অবশ্য আরো কিছুকাল শুধু প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের জন্যেই সমুদ্রের ওপরে আরো বেশি করে নির্ভর করা চলতে পারে। আপাতত পৃথিবীতে প্রোটিনজাতীয় খাদ্যেরই অভাব সবচেয়ে বেশি। এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অভাব ভবিষ্যতে অবশ্যই তীব্রতর হবে। অথচ এই

বিপুল সমুদ্র তার বিপুল প্রোটিন-ভাণ্ডার নিয়ে আমাদের প্রায় নাগালের মধ্যেই রয়েছে!

সামুদ্রিক জীবসম্পর্কে অধ্যাপক হলডেনের প্রবন্ধ থেকে কিছু তথ্য উদ্ধার করা যেতে পারে। অধ্যাপক হলডেন বলছেন: "আমি নিজে মাছ খাই না। কিন্তু স্তন্যপায়ী জীব বা পাখি খাওয়ার চেয়ে আমি বরং মাছ খাওয়াটাই পছন্দ করব। মুণ্ডহীন শামুক খেতেও আমার কোনো আপত্তি নেই। যেমন, অয়স্টার। ভারতের অধিকাংশ লোক অবশ্য শামুককে খাদ্য বলেই গ্রাহ্য করে না। উদ্ভিদের মতো শামুকেরও অবশ্য প্রাণ আছে। তবে শামুকের খুব বেশি চেতনা (consciousness) থাকা সম্ভব নয়। কাজেই আমি মনে করি যে মাংসের সরবরাহ বৃদ্ধি করার চেয়ে মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি করার পক্ষেই যুক্তির ভার বেশি।"

সমুদ্রের মাছ অধিকাংশই আমিষভোজী। অর্থাৎ, সমুদ্র হচ্ছে নির্বিচার এক হানাহানির এলাকা। সেখানে বড়রা ছোটদের ভক্ষণ করে থাকে। ছোটরা আরো ছোটদের। আর একেবারেই যারা ছোট তারা খুব সম্ভবত উদ্ভিদভোজী। এর কারণ সম্ভবত এই যে সমুদ্রের উদ্ভিদ স্থলভাগের উদ্ভিদের মতো বৃহদাকার নয়। ফলে, খুব ছোট ছোট জীবের পক্ষেই এই উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব।

সমুদ্রের কোন জাতের মাছের খাদ্য কোন ধরনের জীব তা নিশ্চয়ই জীববিজ্ঞানীর অনুশীলনের বিষয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত খবর সংগ্রহ করতে পারলে অন্য দিকেও সুবিধে। ভক্ষ্যের পরিমাণ থেকে ভক্ষকের বংশবৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা হতে পারে। অবশ্য ভারতে এখনো সমুদ্রের মাছ ধরা হয় তীরের খুব কাছাকাছি এলাকাতেই। জেলেরা সাধারণত সকালে বেরিয়ে বিকেলের মধ্যেই গ্রামে ফিরে আসে। মাছ ধরার জন্য একটানা কয়েক সপ্তাহ বাইরের সমুদ্রে কাটিয়ে আসার রীতি এখনো আমাদের দেশে শুরু হয় নি। এ অবস্থায় ভক্ষ্য ও ভক্ষকের বিশ্লেষণ বিশেষ কাজে না লাগারই সম্ভাবনা।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হলডেন তাঁর প্রবন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বঙ্গোপসাগরে মাছ-ধরার ব্যাপারে ভারতীয়দেরই আধিপত্য থাকবে—এমনটিই আশা করা উচিত ছিল (অবশ্যই বঙ্গোপসাগর ভারতীয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত নয়, বহিঃসমুদ্রের কোনো এলাকাই কোনো দেশের নয়)। কিন্তু দেখা

যাচ্ছে, আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাপানী জেলেদের। ব্যাপারটা শুধু জেলেদের তৎপরতার মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। তার আগে জীববিজ্ঞানীদের কাছ থেকে হদিশ পাওয়া দরকার—বছরের কোন সময়ে সমুদ্রের কোন বিশেষ এলাকায় মাছের ঝাঁক হাজির হয়ে থাকে। আর এজন্যে অবশ্যই সমুদ্রের বিন্দুসদৃশ পোকামাকড় সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করা চাই। ভারতে সামুদ্রিক জীবসম্পর্কে যে-ধারায় গবেষণা চলেছে তাতে অধ্যাপক হলডেন উৎসাহিত হবার কারণ খুঁজে পান নি।

অধ্যাপক হলডেন মাছ খান না বলেই হয়তো গভীর সমুদ্রের মাছ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উৎকট ঠাট্টাটা গায়ে মাখেন নি।

যাই হোক, গভীর সমুদ্রের কথায় ফিরে আসা যাক। সাম্প্রতিক কালের বিজ্ঞানীরা একটি অসাধ্যসাধন করেছেন। কিছুকাল আগে পর্যন্ত সমুদ্রের তলদেশে সশরীরে হাজির হওয়া একেবারে অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে করা হতো (জুলে ভার্ণে যাই লিখুন না কেন)। কারণ সমুদ্রের জলে প্রতি দশ মিটার গভীরতায় চাপ বাড়ে ৮·৩৫ কিলোগ্রাম হিসেবে। এ-অবস্থায় যান্ত্রিক আয়োজন ছাড়া কোনো ডুবরীর পক্ষেই হাজার মিটারও ডুব দেওয়া সম্ভব নয়। এই যান্ত্রিক আয়োজনটি সম্প্রতি সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া পারমাণবিক তেজে চালিত এমন ডুবোজাহাজও তৈরি হচ্ছে যার সাহায্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে গভীর সমুদ্রে অবস্থান ও বিচরণ করা অসম্ভব নয়। একই সঙ্গে বিজ্ঞানীরা আরো একটি কল্পনাতীত কাণ্ড ঘটাতে চলেছেন। সমুদ্রের তলদেশ থেকে গর্ত খুঁড়ে ভূ-অভ্যন্তরের নমুনা সংগ্রহ করা। সোভিয়েত ও মার্কিন দেশে এ-সম্পর্কে ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক হলডেন সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে চমৎকার একটি বর্ণনা দিয়েছেন। সেটি উদ্ধৃত করেই এই আলোচনা শেষ করছি। অধ্যাপক হলডেন বলছেন: "প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে নানা লোকের বর্ণনা আছে। এমনি একটি লোক হচ্ছে মাটির নিচের পাতাল। এই পাতালে সূর্যের আলো না থাকা সত্ত্বেও উজ্জ্বল আলো রয়েছে। পাতাল কেউ কোনোদিন চোখে দেখে নি। তবে গভীর সমুদ্র কিন্তু অন্ধকার নয়। সূর্যের আলোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না কারণ এমন কি স্বচ্ছতম জলেও সূর্যের আলো একশো মিটারের বেশি গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। সমুদ্রের নিচে শ-সাতেক মিটার নামতে পারলে এমন এলাকায় পৌছনো

যাবে যেখানে চারিদিক 'কৃত্রিম' আলোয় উদ্ভাসিত। ব্যাপারটাকে তখন আর কৃত্রিম বলে মনে হয় না। গভীর সমুদ্রের দশ-ভাগের ন-ভাগ মাছই আলোক-উদ্ভাসী।"

সমুদ্রের তলদেশের এই আলো চাঁদের আলোর চেয়েও ফুটফুটে এবং অধ্যাপক হলডেন আশা প্রকাশ করেছেন যে আগামী একশো বছরের মধ্যেই আমরা হয়তো গোরু-ছাগল পালন করার মতো কয়েক জাতের আলোক-উদ্ভাসী জীবকেও পালন করতে শিখব। সে-সময়ে খুব সম্ভবত শহরের রাস্তাঘাটে এই 'জৈবিক' আলোরই ব্যবস্থা করা হবে।

ইতিমধ্যে অধ্যাপক হলডেনের সঙ্গে আমরাও আশা করব—সমুদ্র বিজ্ঞানে গবেষণার সাহায্যে রাষ্ট্রীয় দাক্ষিণ্য আরো অকৃপণ হবে।

অমল দাশগুপ্ত

ভ্রম সংশোধন

চৈত্র সংখ্যার ৯৯৪ পৃষ্ঠার সপ্তবিংশ পংক্তির শুদ্ধপাঠ হবে: পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধা সিকেরাস আজও মেক্সিকোর কারাগৃহে অবরুদ্ধ।

আজকের প্রহসন

আশ্চর্য হতে হয়, অভিনয় ও প্রয়োগনৈপুণ্যের এই পরাকাষ্ঠায়। শ্রীসবিতাব্রত দত্ত-এর পরিচালনায় 'রূপকার' অমৃতলাল বসু রচিত সম্প্রদায়ের 'ব্যাপিকা বিদায়'-রূপায়ণ মনে রাখার মতো। উনিশ শতকের সামাজিক ব্যঙ্গনাট্যের ঐতিহ্যে রচিত এই নাটকটিতে অবশ্য ব্যাঙ্গোক্তির, irony বা এমনকি satire-এরও জ্যাবদ্ধ নির্মমতা প্রহসনের প্রগল্‌ভতায় বিলীন। 'সধবার একাদশী' বা হুতোমের শুদ্ধতা এতে অনুপস্থিত।

তবু, সেকালের মানুষদের প্রাক্‌রবীন্দ্রিক চলনে বলনে এক ধরনের মেঠো সরসতা ছিল, যা এই নাটককে মাঝে মাঝে প্রায় burlesque-এর পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে, এবং যা আজ আমরা আমাদের আধাশহুরে বৈদগ্ধ্যের মিড্-ভিক্টোরীয় কুশিক্ষায় হারিয়েছি। মনুষ্যজিহ্বার সে অবাধ র‍্যাবেলে-সুইফ্ট-ভল্‌তেয়র-বাল্‌জাক-জাতীয় অভিব্যক্তিকে অসুস্থ মুখ খারাপে পর্যবসিত না করে যদি ফিরিয়ে আনা যেত মন্দ হতো না—"সন্ন্যাসিনী" শব্দটির বদলে এই নাটকের জ্ঞানী-ভাঁড়টি যেমন অনায়াসে "মাদী সন্ন্যাসী", থুড়ি, "মেয়েছেলে সন্ন্যাসী", বলে ফেলে। ফিরিয়ে আনতে পারা প্রয়োজনও। কারণ, যে 'বাঙালী' অঙ্গারবর্ণা মেম-শ্বাশুড়িটির ইংরেজিয়ানার বিরুদ্ধে এই নাটকের শাণিত আক্রমণ, তাঁকেই তো আবার এই সেদিন দেখলুম স্বাধীনবাঙলায় শিক্ষার পীঠস্থানের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে। গত শতকে যখন নাকি একবার 'রেনেসান্স' হয়েছিল বাঙলাদেশে, তখন 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ বাক্সরণ আওড়াতে আওড়াতে "ব্যা ব্যা" শব্দে ডেকে উঠেছিল। নব্যস্বাধীনতার জমাটি সমাজতন্ত্রী-আসরে উক্ত নিমচাঁদের নবরূপ দেখতে পেলে লোকে খুশিই হবে। ন্যাকামি ও হিস্টিরিয়ার লবণাক্ত স্রোতও বঙ্গসমাজের বিশেষ মহলে, অন্দরে ও বাহিরে এখন তো নবোদ্যমে বহমান। আর, ৺অমৃতলালের সেই 1st Class Patriot, 2nd Class Section I Patriot ইত্যাদি Patriot-শ্রেণীর বিন্যাস তো আজকাল আরো নব নব রূপে বিকশিত। অতএব 'ব্যাপিকা বিদায়'-এর অসমাপ্ত কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'রূপকার' সম্প্রদায় কালোপযোগী কাজই করেছেন।

সে কাজে তাঁদের প্রয়োগনৈপুণ্যও একেবারে বিস্ময়কর। দলগতভাবেই অভিনয়ের উৎকর্ষ সংশয়াতীত। গমকে গমকে নাটক এগিয়ে চলে, প্রায় কোনো ছন্দপতন ছাড়াই, বেতালা ঘাটে একবারও না পড়ে। ব্যক্তি ধরে বলতে গেলে সর্বাগ্রে বলা উচিত শ্রীবঙ্কিম ঘোষের নাম, ঘনশ্যাম সিকদার নামক জ্ঞানী-ভাঁড়ের ভূমিকায়। কোনো অত্যুক্তিই হবে না যদি বলি যে তাঁর অভিনয়ে কোনো কোনো মুহূর্তে সত্যিই Sublime ও ridiculous-এর হরিহর আত্মার পরিচয় মেলে। তারপরেই করতে হয় বৃদ্ধ সঞ্জীব চৌধুরীর ভূমিকায় শ্রীসবিতাব্রত দত্তর, জটিলেশ্বর ভাদুড়ির ভূমিকায় শ্রীভবরূপ ভট্টাচার্যর, মিসেস লাহিড়ীর ভূমিকায় শ্রীমতী স্মৃতি মিত্র ও ঝি-এর ভূমিকায় শ্রীমতী কমলা ব্যানার্জির নাম। মেম-শ্বাশুড়ির ভূমিকায় শ্রীমতী কালিন্দী সেন-এর অভিনয়ের stylisation, রীতিবিন্যাস, কিন্তু সব জায়গায় অনিবার্য হয়ে ওঠে নি, যেমনটি হয়েছে অন্যদের বেলায়।

'রূপকার' নাটকটি অনেকবার করুন ও কলকাতার লোকে দেখুক কামনা করি।

বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়

প ত্রি কা প্র স ঙ্গ

বাঙলা সাময়িকপত্রজগতে যদিও সিনেমা তথা লঘুরসের কারবারী পত্রপত্রিকাগুলিই জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে তবু ইদানিং চিন্তাশীল এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধের চাহিদা কিছু বেড়েছে। প্রকাশক মহলেরও খবর, প্রবন্ধের বই আজকাল কিছুকিছু বিক্রি হয়। এমন কি প্রধানত প্রবন্ধ-আশ্রিত পত্রিকাও আজকাল কেউ কেউ বের করতে উদ্যোগী হয়েছেন এবং চালিয়ে যেতে পারছেন। নিরাশাবাদীরা অবশ্য বলতে পারেন, একটি কি দুটি কোকিল বসন্তের সূচনা করে না। তাঁদের কথা মেনে নিলেও বলতে হয়, এই ঝোঁকটা বসন্ত না হোক, বসন্তের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই। আর তাই তাকে স্বাগত না করে পারা যায় না।

গত কয়েকমাসে নানা পত্রপত্রিকায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে পাঠকদের দৃষ্টি তার প্রতি আকর্ষণ করার জন্যই এই নিবন্ধের অবতারণা। কোনো কোনো রচনা সম্পর্কে কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য অবশ্য করা হবে, সে শুধু আলোচনার একটা সূত্র ধরিয়ে দেবার জন্যই—বাঙলা প্রবন্ধসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা উপস্থাপন করা এই আলোচনার লক্ষ্য নয়। ভুল বোঝাবুঝি এড়াবার জন্য আরও একটি কথা প্রথমেই বলে রাখা দরকার—এই পর্যায়ের এই প্রথম আলোচনাটির জন্য কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয় নি। দ্বিতীয়ত, বর্তমান লেখক সমস্ত উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি। ফলত, অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হয়তো এ-আলোচনায় অনুল্লেখিত থাকবে। বলে রাখা দরকার এই অনুল্লেখ অনিচ্ছাকৃত। তৃতীয়ত, এই আলোচনায় ছোট কাগজগুলিকেই অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য দেওয়া হবে। তার কারণ, তথাকথিত বড় কাগজগুলি অনেকেরই চোখে পড়ে আর তাতে গুরু প্রবন্ধের স্থান অপেক্ষাকৃত গৌণ। চিন্তাশীল ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছোট কাগজগুলিতেই বেশি বেরয় এবং তা অনেকেরই দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়।

গত তিন-চার মাসের মধ্যে যে প্রবন্ধটি সবচেয়ে বেশি বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, এবং যার জের এখনও মেটে নি তার উল্লেখ করেই এই আলোচনার সূত্রপাত

করব। 'দেশ' পত্রিকায় 'সময় সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগে শঙ্খ ঘোষের সাম্প্রতিক বাঙলা কাব্য সম্পর্কিত প্রস্তাবটির ['দুই বসন্তে'] কথাই বলছি। শঙ্খ ঘোষ নিজে কবি। কবিতা সম্পর্কে তাঁর মতামত নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুধাবনযোগ্য। সম্প্রতিকালে তাঁর যেসব প্রবন্ধ পড়বার সুযোগ হয়েছে (দুটি এক নিঃশ্বাসেই উল্লেখ করতে পারি : 'রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প' সঙ্কলনে রবীন্দ্রনাটকে গান সম্পর্কিত প্রবন্ধটি এবং 'একতা'য় 'নাট্যমুহূর্ত ও ভাষার সন্ধান') তাতে তাঁর স্থিতধী সাহিত্যবোধের পরিচয় পেয়েছি। তবু না বলে পারছি না, 'দেশ' পত্রিকার এই প্রবন্ধের অধিকাংশ সিদ্ধান্তের সঙ্গেই আমরা একমত হতে পারি নি, আলোচনার পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও না। কিন্তু আর কোনো কারণে না হোক, একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনার সূত্রপাত করতে পেরেছে বলেই এই প্রবন্ধটি বিশেষ মর্যাদা দাবি করতে পারে। কবিতা সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন মৃগাঙ্ক রায় মাঘ-চৈত্র সংখ্যা 'নতুন সাহিত্য'-এ ['আধুনিক বাঙলা কবিতা : কালান্তরের চিন্তা']। শ্রীরায়ের বক্তব্যও বিতর্কমূলক, কিন্তু তা নিয়ে কেন যে কোনো আলোচনার সূত্রপাত হলো না, জানি না।

বাঙলা ছোটগল্পের সর্বাধুনিক ঝোঁক সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে ('সময়ের চাবি' : শান্তি বসু) 'এক্ষণ' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যায়। শ্রীবসুর বক্তব্যের সঙ্গে বর্তমান লেখকের অনেক বিষয়েই মতৈক্য আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হয় ছোটগল্পের কাছে তিনি ইতিমূলকভাবে ঠিক কী দাবি করেন তা পরিষ্কার হলো না। কৌতূহলী পাঠক প্রায় একই বিষয়ে 'একতা' সঙ্কলনে দেবেশ রায় ('ছোটগল্প : রাবীন্দ্রিক ও অ-রাবীন্দ্রিক') ও সুবীর রায়চৌধুরীর ('রবীন্দ্রোত্তর উপন্যাস : নৈরাজ্য এবং নিরীক্ষা') প্রবন্ধ দুটি পড়ে দেখতে পারেন। শান্তি বসু এবং সুবীর রায়চৌধুরী যাঁদের সমালোচনা করেছেন—দেবেশ রায়ের প্রবন্ধে তাঁদের বক্তব্য জানা যাবে।

ইদানিং বাঙলা সাহিত্যে একটি নতুন আন্দোলনের কথা শোনা যাচ্ছে—যাকে বলা যেতে পারে কাব্যনাট্য আন্দোলন। কবিরা অনেকেই কাব্যনাট্য রচনায় হাত দিয়েছেন—কিছু কিছু অভিনয়েরও আয়োজন করা হচ্ছে। কিন্তু কাব্যনাট্য বস্তুটি কী—তাতে নাট্য কতখানি থাকবে আর কতটা কাব্য—এসব বিষয়ে সাধারণ পাঠক তথা দর্শক-শ্রোতার ধারণা স্পষ্ট নয়। কাব্যনাট্য সংখ্যা 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় এ-সম্পর্কে কয়েকটি সুলিখিত প্রবন্ধ

প্রকাশিত হয়েছে, যথা, 'দুই ভুবন, একভাষা' / অশ্রুকুমার সিকদার, 'বঙ্গমঞ্চ ও কাব্যনাট্য' / অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এছাড়া য়েটসের কাব্যনাট্যের ভূমিকার একটি তরজমাও প্রকাশিত হয়েছে।

কাব্যনাট্য আন্দোলন সম্পর্কে আমরা কৌতূহলী। কবিতা এবং পাঠক-সমাজের বিচ্ছেদ সুবিদিত। কে জানে কাব্যনাট্যই হয়তো এদের মধ্যে মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করবে। 'গন্ধর্ব'-র পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে এ-সম্পর্কে আরও আলোচনার জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করব।

'সুন্দরম'ই বোধহয় বাঙলা ভাষায় একমাত্র শিল্প-বিষয়ক পত্রিকা। এই পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যাটি আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য বিশেষাঙ্ক (দ্বিতীয় খণ্ড) হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। রাশিয়া, পূর্বজার্মানি ও পোল্যাণ্ডের ভাস্কর্য সম্পর্কে কয়েকটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ ছাড়াও আছে ঐ-সব দেশের ভাস্কর্যশিল্প নিদর্শনের বহুসংখ্যক সুন্দর আলোকচিত্রের প্রতিলিপি। কয়েক বছর আগে সোভিয়েত চিত্রকলা প্রদর্শনী উপলক্ষে 'পরিচয়'-এ অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, অতুল বসু প্রমুখের যে মূল্যবান আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল এই সংখ্যায় তা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

'চতুরঙ্গ'র রবীন্দ্রশতবার্ষিক সংখ্যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যার চারটি প্রবন্ধই সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থের ইংরাজি প্রবন্ধের তরজমা। এর মধ্যে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর প্রবন্ধটিও আছে। তবে এই সংখ্যার পুস্তক-পরিচয় বিভাগটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। গত এক বছরে রবীন্দ্রালোচনার যে বহুসংখ্যক গ্রন্থ ও সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রায় সবকটিরই সম্যক এবং দায়িত্বশীল আলোচনা আছে এই বিভাগে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, 'দেশ' রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যায় রবীন্দ্রসাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে কয়েকটি অতিমূল্যবান আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে এই সংখ্যায় পুলিনবিহারী সেনের 'রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্র' প্রবন্ধটির প্রতি আমরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত এক বছরের রবীন্দ্রানুশীলনের একটি সমীক্ষা পাওয়া যাবে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের 'শতবার্ষিকী বৎসরে রবীন্দ্রচর্চা' প্রবন্ধে। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর প্রবন্ধটির পরিপূরক হিসাবে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'বিজয়ার করকমলে' প্রবন্ধটি পাঠ্য। বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালি' প্রবন্ধটি 'টু

সিটিজ'-এর প্রবন্ধটির মতো অশ্রদ্ধাসূচক নয়। চমকপ্রদ সিদ্ধান্তের তুরঙ্গে জন গিলপিন সুলভ অভিযাত্রার লোভ যে তিনি সংবরণ করেছেন এতে আশ্বস্ত বোধ করছি। স্টিফান হে-র প্রবন্ধ তথ্যবহুল।

নতুন পত্রিকা 'উত্তরকাল'-এর প্রথম সংখ্যা আমাদের হাতে এসেছে। দুটি মাত্র মৌলিক প্রবন্ধ আছে সংখ্যাটিতে : 'আফ্রিকা : সভ্যের বর্বর লোভ'/ রবীন্দ্র মজুমদার ও 'নৈঃসঙ্গ্যের দীপ্তি' / সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'নৈঃসঙ্গ্যের দীপ্তি' একটি ভালো প্রবন্ধের প্রতিশ্রুতি। এরিখ হার্টলে-র প্রবন্ধটি এক দশক পরে তরজমা করার সার্থকতা সম্পর্কে অন্তত আমি নিঃসন্দেহ নই। সোভিয়েত সাহিত্য সম্পর্কে সোভিয়েত দেশেই নতুন মূল্যায়ণ হচ্ছে—সমাজ বাস্তবতা বলতে কী বোঝায় তা নিয়েও নতুন করে আলোচনা চলছে। এই প্রবন্ধটি থেকে সে সম্পর্কে কোনোই আলো পাওয়া যাবে না। বিভাগীয় রচনাগুলি অগভীর ও অ্যামেচারসুলভ। সম্পাদকীয়তে যে প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়েছে তা কার্যকরী করতে হলে সম্পাদকদের এ-বিষয়ে অবহিত হতে হবে।

প্রগতি সাহিত্যের সুস্থ বিকাশ ও নৈরাজ্য এবং অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে যথার্থ সংগ্রাম এক মহৎ আদর্শ। এই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে তাঁরা ক্রমশই অধিকতর প্রাজ্ঞতা ও সৎনিষ্ঠার পরিচয় দেবেন আমরা এমন আশা রাখি।

শচীন বসু

পু স্ত ক প রি চ য়

গোরা কালার হাট। অশোক গুহ। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। ৮.৫০।

এই উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক অসবার্ট সিট্‌ওয়েলের মত উল্লেখ করে বলেছেন : "উপন্যাস ফর্মহীন, স্যুটকেশ সদৃশ বা। সে স্যুটকেশটি সজ্জিত হবে তার মালিকের রুচি এবং তাঁর গন্তব্যস্থান অনুসারে।" অর্থাৎ গন্তব্যস্থানের গুরুত্ব অনুযায়ী ভ্রমণকারী যেমন তাঁর স্যুটকেশে জামাকাপড় টুকিটাকি জিনিসপত্র গুছিয়ে নেন, তেমনি উপন্যাসের আধারে বিষয়বস্তু অনুসারে লেখক টুকিটাকি ঘটনা গুঁজে দেবেন। বস্তুত লেখক সেই ভাবেই তাঁর উপন্যাসখানিকে বিচার করে দেখতে বলেছেন। তাঁর নিজের কথায় : "এর গন্তব্যস্থল দুশো বছরেরও আগেকার বাংলা, যখন তার নাম কালাদের মুখে মুখে বাঙ্গালা, এমন কি গৌড়বঙ্গ বলে প্রচারিত হলেও বিস্ময়ের কারণ ছিল না ; আর ধলাদের মুখে তো সে ছিল বেঙ্গল-বেঙ্গালা। সেই সাবেক কালে বাংলার নানা জায়গা থেকে বহু মানুষের ধারা এসে মিশেছিল খালকাটা-কলিকাতা-ক্যালকাটায়—আবার বিদেশ থেকে ধলা মানুষের ধারাও এসে মিশেছিল—গড়ে উঠেছিল গোরার শ্রীপাট। সেই গন্তব্যগামী হতে স্যুটকেশ ভরতি করতে হলো তখনকার সমাজ আর ইতিহাসের রকমারি সাজসরঞ্জামে, রীতিনীতির টুকিটাকি এ-কোনে ও-কোনে গুঁজে দিতে হলো। আর তাতে করে এশিয়ার যে কিস্‌সা-কাহিনীর ঐতিহ্য মহাভারত-জাতক-আলিফ্‌ লয়লা ওয়া লয়লা থেকে বহতা—যা নানা সরিৎসাগর পার হয়ে একালে এসে ঠেকেছে, সেই কিস্‌সা কাহিনী আর ইতিহাসে জুটি বাঁধবারও একটা লক্ষণ দেখা দিলে। আবার এ-কালীন মন তাঁর ওপর কারিকুরি করতেও ছাড়লে না। এই সব মিলিয়ে-জুলিয়েই সেজে উঠেছে এই উপন্যাসের ফর্ম।"

এই উক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে লেখক ইতিহাসের রকমারি সাজসরঞ্জাম এবং রীতিনীতির টুকিটাকি এ-কোনে ও-কোনে গুঁজে দিয়ে আর তার ওপর লেখকের একালীন মনের কারিকুরির প্রলেপ দিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনী ফেঁদেছেন, নজীর হিসাবে 'মহাভারত' ইত্যাদির নাম করেছেন। কিস্‌সা-

কাহিনী এবং ইতিহাসের একটা জুটি বাঁধবার চেষ্টাই এই উপন্যাসে তিনি করতে চেয়েছেন।

লেখকের এই "মিলিয়ে-জুলিয়ে" প্রচেষ্টাটি এখন কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হলো সেটা এইবার বিবেচনা করে দেখা যাক। লেখক এই প্রচেষ্টায় দুশো বছরেরও আগেকার বাংলাদেশের সমাজের নানা রীতিনীতি, ইতিহাসের নানা ঘটনা, কয়েক জায়গায় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ইত্যাদি মালমশলা যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করেছেন যদিও তার অধিকাংশই আমাদের অজানা ছিল না। পর্তুগীজ-হার্মাদ, ব্যবসায়ী ইংরেজ, দেশী শেঠ শেঠিয়া, জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ, চক্রবীরদের শক্তিসাধনা, নবাবী আমলের নাচগান ফুর্তি তামাশা, স্বামীর মৃত্যুর পর সতী নারীর চিতায় অনুগমন, বৈষ্ণবদের সাধনপদ্ধতি, নিমকের একচেটিয়া ব্যবসাকাঙ্ক্ষী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, ইংলণ্ড থেকে সদ্য আগত সাহেববিবির বিবিধ ক্রিয়াকলাপ, নন্দকুমারের ফাঁসি ইত্যাদি নানা ঘটনা এবং তথ্য মিলিয়ে-জুলিয়ে লেখক এই কিস্‌সা-কাহিনীর জাল বুনেছেন ; কিন্তু এত উপকরণ এত পরিশ্রম এত অধ্যবসায় যদি কাহিনীকে প্রাধান্য দেবার জন্যে হতো, বা একটা সুসংবদ্ধ গল্প বলার জন্যই যদি এগুলি তিনি অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করতেন তবে নিশ্চয় আমরা লেখকের ক্ষমতার এবং পরিমিতিবোধের তারিফ করতাম। তা করতে পারা যাচ্ছে না বলে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

'মহাভারত'-এর নজীর লেখক দেখিয়েছেন বলেই একটা কথা লেখককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার। 'মহাভারত'-এ নানা কাহিনীর সমাবেশ, নানা ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত। কিন্তু লক্ষ লক্ষ চরিত্র, হাজার হাজার ঘটনা থাকলেও সেখানে একটি কেন্দ্রীয় কাহিনী আছে ; তার প্রস্তুতি, বিস্তার এবং পরিণতি আছে। প্রত্যেকটি ঘটনা সেই সুসংবদ্ধ কাহিনীর প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়েছে, তারা inevitable, excess নয়। সুদীর্ঘ আঠারোটি পর্বের ডালপালা ছড়িয়ে একটি দেশ-কাল ও মানুষের মিলিত ভূমিখণ্ডে সেই বিরাট মহীরুহ দণ্ডায়মান। কিন্তু এই উপন্যাসে সেইরকম কেন্দ্রীয় একটি কাহিনী আছে কি? লেখক তাঁর এই উপন্যাসের প্রথম সাতটি অধ্যায়ে সাতটি আলাদা কাহিনী বলেছেন ঠিকই, কিন্তু সেগুলি আলাদা কাহিনী মাত্রই ; সম্ভবত ইতিহাসের মালমশলা সংগ্রহ এবং প্রদর্শনের নমুনা হিসাবেই সেগুলি ব্যবহৃত। এই সাতটি কাহিনী, আলাদা আলাদা ভাবে

সুখপাঠ্যও বটে, কিন্তু এই কাহিনীগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন, মূল কাহিনী (যদি কিছু থাকে) তাদের দ্বারা কোথাও দানা বেঁধে ওঠে নি, কোথাও সেগুলি মূল কাহিনীর পক্ষে inevitable নয়—নেহাৎই একটা ডকুমেণ্টারি ছবির মতো চোখের ওপর দিয়ে সেগুলি ভেসে যায়, মনে কোনো দাগ কাটে না।

কোনো দাগ কাটে না তা এই কাহিনীগুলির চরিত্রকটির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। প্রথম অধ্যায়ের মকরন্দ সংস্কৃতকাব্য ভালো করেই পড়েছেন, হাফিজ আওড়াতে পারেন, গোলেবকাওলির কিস্সা বলতে পারেন, আবার সারেঙ্গি বাজিয়ে গজল গাইতে পারেন দ্রাক্ষাবনের, রাগরাগিণীর আলাপও সেতারে বাদ যায় না (ছবিটা কেন আঁকতে পারেন না বোঝা গেল না); সেই মকরন্দ বিদ্যাসুন্দরী কায়দায় এক আলাপিনী যোগাড় করে রাইয়ের কাছে প্রেমপত্র পাঠালেন, রাইকে পরে বিবাহ করলেন—সর্ত রইল একবৎসর স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবেন না, হলে স্ত্রী বিপদগ্রস্তা হবেন। কিন্তু ভাগ্যের চক্রান্তে তা মেনে চলা মকরন্দের পক্ষে সম্ভব হলো না, বিয়ের কিছুদিন বাদেই তিনি নিষিদ্ধ কাজটি করলেন, রাইয়ের সন্তানসম্ভাবনা দেখা গেল, মকরন্দ কিছুদিনের জন্যে বাইরে গেলেন, ফিরে এসে দেখলেন গ্রাম শ্মশান, পর্তুগীজ জলদস্যুরা গ্রাম লুঠ করে নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, রাইকেও দংশন করেছে। রাই জানে তার জাত গিয়েছে, শ্বশুর তাকে সংসারে ফিরিয়ে নিতে চায় না। কারণ সে গন্ধরোগগ্রস্তা, মা মাথা চাপড়িয়ে ভাগ্যের দোষ দেন কিন্তু মকরন্দ তাকে ফিরিয়ে নিতে চায়। অবশ্য তা হলো না, রাই নিরুদ্দেশ হয়ে গেল চিরদিনের মতো, আর মকরন্দ চলে এলো কলকাতায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের মেরী পাদরি-বাবার আশ্রয়ে ছিল লণ্ডনের এক মঠে। সুন্দরী মেরী সিন্থিয়া, ডরোথিয়া, সিল্ভিয়াকে ছাপিয়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিভিনিটিশাস্ত্রপড়া পাদরিগিরির শিক্ষানবিশ হেনরির কাছে ধরা দিয়ে কুমারী অবস্থায় জননীতে পরিণত হলো, যথারীতি হেনরির নাম মেরী জানাল না, সন্তান চলে গেল অনাথআশ্রমে, মেরী পরিণত হলো এক বহুবল্লভায়; কশাই-ধোবা-জাহাজের লস্করের সঙ্গে রাত কাটায় মেরী, হেনরিও এক শয়তানে পরিণত হলো, তারপর দুজনেই ভাগ্যের সন্ধানে চলে এলো কলকাতায়। তৃতীয় অধ্যায়ের লাডলীমোহনও মকরন্দের মতো নাগরস্বভাব।

সেও সংস্কৃত-ফারসীতে পদ্য লিখতে পারে। ফিরোজা, রুমাবাই, যমুনা—বহু সুন্দরী রমণীর সে সঙ্গলাভ করেছে, কিন্তু শেষে বিয়ে করতে হলো কুৎসিত কুরূপা থাকমনিকে। পিতা প্যারীমোহন কবিরাজ, শক্তিসাধনা করেন তান্ত্রিকমতে চক্র করে ভৈরবী নিয়ে। লাডলীমোহন একদিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে চড়িভাতি করতে গিয়ে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এক চণ্ডালিনীর ঘরে আশ্রয় নিলেন, তাকে ভালো লাগল। ঘটনাচক্রে সেই চণ্ডালিনী এলো ভৈরবী হয়ে প্যারীমোহনের তন্ত্রসাধনায়, ব্যভিচারী চক্রবীরদের কামলালসায় সে এবং তার মা প্রাণ হারাল, বাধা দিতে গিয়ে চক্রের পুরোহিত প্রাণ হারালেন, মাতাল পিতার মুখে পদাঘাত করে পুত্র লাডলীমোহনও মথুরাপুর ছেড়ে চলে এলেন কলকাতায়। এইভাবেই কলকাতায় এসেছে হরানন্দ গঙ্গাগ্রামী, সিরাজের হত্যায় সে ব্যথিত, সে জানতে চায় তার জন্যে মোহনলালের বেটী, পল্লীবাংলার কবি কাঁদে কেন। হরানন্দের দাদা ধীরানন্দ, বৌদি কৃষ্ণরঙ্গিনী। ধীরানন্দ তাড়াশের নায়েব, পরে কোম্পানি বাহাদুরের ইজারাদার নন্দলালের অধীনে কাজ নিয়েছেন রানী ভবানীকে ছেড়ে। ইজারাদারদের অত্যাচারে প্রজারা বিদ্রোহ করে, সেই বিদ্রোহী প্রজাদের হাতে মারা গেলেন ধীরানন্দ, কৃষ্ণরঙ্গিনী গেলেন সহমরণে আর হরানন্দ গঙ্গাগ্রামী চলে এলেন কলকাতায় ইংরেজের স্বরূপ বুঝতে। পঞ্চম অধ্যায়ের বৈষ্ণবী মেয়ে চাঁপালতা সখীভজা-নাগর মাধবের ভালোবাসাকে অগ্রাহ্য করে আখড়ার নীলমণিরূপী সয়ার প্রেমে পড়ল, সয়া তাকে ঠকিয়ে ভরার নৌকায় করে নিয়ে এলো কলকাতায়। তার কারবার ছিল এই রকম ভাবে মেয়ে জোগাড় করে শহরে চালান দেওয়া—সেখানে সেই মেয়েরা বিক্রীত হবে কোনো টোলের বামুনের কাছে, কুলীন ব্রাহ্মণের কাছে—তাদের ঘরসংসার করবে। চাঁপালতাও অতএব এলো কলকাতায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ের পীতাম্বর নুনের চোরাকারবারী বিরজু প্রধানের পাল্লায় পড়ে কোম্পানির পুলিশের হাতে নিষ্ঠুরভাবে প্রহৃত হয়ে পালিয়ে চলে এলো কলকাতায়। আর সপ্তম অধ্যায়ের কাহিনী নীলাম্বর পানিকে নিয়ে, বাবা পীতাম্বর পানি কাপড় আর রেশম বেচে ক্রোড়পতি। নীলাম্বরের প্রেমিকা ছিল আর্মানি মেয়ে মরিয়ম, স্ত্রী ইন্দুরেখা। মরিয়ম চট্টগ্রামে চলে যাবার সময় নীলাম্বরকে দিয়ে গেলেন এক নীলা। সেই নীলার অভিশাপে বোধহয় পীতাম্বর কুঠির আগুনে পুড়ে মরলেন, নীলাম্বর

হলেন নিঃস্ব। পত্নী ইন্দুরেখাকে নিয়ে নিজের জলসাঘরে একরাত্রি কাটিয়ে নিদ্রিতা স্ত্রীকে ফেলে রেখে তিনিও চলে এলেন কলকাতায়। তারপরের চারটি অধ্যায়ে মহারাজা নন্দকুমারের শেষজীবন, তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত, তাঁর বিচার এবং ফাঁসি বর্ণিত হয়েছে।

সমগ্র উপন্যাসের কাহিনীর যে কাঠামো দেওয়া হলো তাতেই বোঝা যাবে এই কহিনীর মধ্যে একটা অখণ্ডতা দানা বেঁধে ওঠে নি। প্রেমে ব্যর্থ বা হতাশ্বাস, কিংবা জীবনযুদ্ধে পরাজিত—এদের নিয়েই কি সেকালের কলকাতা গড়ে উঠেছিল। ইংরেজশাসনের প্রথমদিকে যারা কলকাতায় এসেছিল নিজেদের ভাগ্য গড়ে নিতে, ইতিহাস বলে তারা অন্য শ্রেণীর লোক। সেই সুযোগসন্ধানী লোকগুলি বাদ দিলে দেশের যারা অগণিত জনসাধারণ, তাদের নিঃশব্দ অথচ সুদৃঢ় উপস্থিতি এই উপন্যাসে কোথায়! আট-দশজন লোকের জীবনে নানা ধরনের ব্যর্থতা (যার মধ্যে প্রেমই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান)—এই নিয়েই কি গোরা-কালার-হাট গড়ে উঠেছিল। অসংখ্য চরিত্র এই উপন্যাসে হাজির হয়েছে সত্যি কিন্তু তাদের কোনো ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে নি। মকরন্দ কলকাতায় এসে হলো এক সরাইখানার হিসাবলেখক, লাডলীমোহন হয়েছেন আর্জিলেখক, পীতাম্বর হয়েছে নন্দকুমারের চাকর, চাঁপালতা এক বিধানদাতা কুলীনের ঘরণী—কিন্তু এই হওয়া লেখকের মর্জি এবং সুবিধাকেই অনুসরণ করেছে, নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ধার ধারে নি, বোধহয় নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এদের নেই বলে। ইতিহাসের অমোঘ গতি যারা চিরকাল নির্ধারণ করে, সেই অগণিত মানুষ—তাদের ব্যথা বেদনা যন্ত্রণা অশ্রুজল সংগ্রাম আনন্দ, তাদের নির্ভয় সত্যানুসন্ধান, ব্যর্থতাজনিত পরাজয়—এই সমস্তকে জড়িয়ে নিয়ে যে কালপুরুষ দেশের মাটিতে জন্ম নেয়, তার পরিচয় এখানে কোথায়। দেশ-কাল ও মানুষের যেটুকু পরিচয় এখানে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে সেটুকুও আংশিক এবং আরোপিত—সহজ, স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত নয়। যাঁরা নিজেদের ভিতর থেকে প্রশ্নের মাধ্যমে এবং বাইরের সংঘাতের ধারা অনুসরণ করে ইতিহাসের গতি না বোঝেন তাঁদের এই দুর্দশাই হয়। এই দোষ থেকে আধুনিক বাংলার সর্বজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিক থেকে বিপুলায়তন উপন্যাস রচয়িতাদের অধিকাংশই মুক্ত নন। অশোক গুহ কাহিনী এবং ইতিহাসকে আলাদা করে দেখেছেন। ফলে গল্প চলেছে

একদিকে আর ইতিহাস অন্যদিকে। শেষ চারটি অধ্যায়ে একটি কেন্দ্রীয় কাহিনীর অবলম্বন থাকায় এখানে লেখককে কতকটা বাধ্য হয়েই ইতিহাসকে স্বীকার করতে হয়েছে। ফলে, সেখানে কাহিনী অনেক যুক্তিসহ, লেখকের ইতিহাসবোধ স্পষ্ট এবং বহুপরিমাণে নির্ভুল। কিন্তু আগের সাত-আটটি অধ্যায় লেখকের এই মনোযোগ থেকে বঞ্চিত। মহারাজা নন্দকুমারকে কেন্দ্র করে যে কটি অধ্যায় শেষের দিকে আছে তা নাটকীয়তায়, চরিত্রচিত্রণে, লিপিকুশলতায় ও লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত সহৃদয়তায় সত্যিই চমৎকার এবং বলতে দ্বিধা নেই এই কটি অধ্যায়ই এই বইয়ের প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু বাকি সাতটি অধ্যায় যেন সময়ের সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন এক-একটি দ্বীপের মতো—মাঝখানে সংযোগহীনতার ও অপ্রয়োজনীয়তার সুবিশাল বিস্তৃতি।

তবে যতই ব্যর্থতার কথা বলিনা কেন, তিন-চারশো পাতার যেমন-তেমন বিরাট উপন্যাস লিখে যাঁরা এপিক উপন্যাস লিখেছি বলে আত্মপ্রসাদ এবং সিনেমাওয়ালাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন, অশোক গুহ নিঃসন্দেহে সেইসব তথাকথিত বাজার চলতি ঔপন্যাসিকদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা ধরেন। তিনি form-এর দিক দিয়ে যে পরীক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন, তা তাঁর প্রথম উপন্যাসে অসার্থক হলেও ভবিষ্যতে সফল হবে না এমন বলা যায় না। তিনি উপাদান-সংগ্রহ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেখিয়েছেন, লিপি কুশলতার দিক দিয়েও তাঁর মধ্যে তীক্ষ্ণতা ও মিষ্টতার অভাব নেই। মোটামুটি বুদ্ধিগ্রাহ্য একটা ব্যাখ্যা দেবার দিকেও তাঁর ঝোঁক আছে। সেইজন্যই তাঁর এই নূতন প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু এতগুণ থাকা সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা ব্যালান্সের অভাব, যার ফলে তাঁর উপন্যাস মাঝারির ওপরে উঠতে পারলনা। তবে তাঁর সম্বন্ধে নিরাশ হবার কিছু নেই এটুকু বিশ্বাস তাঁর প্রথম উপন্যাস পড়ে নিশ্চয় আমাদের হয়েছে।

অতীন্দ্র মজুমদার

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবেশক: ডি. এম. লাইব্রেরী। দু টাকা পঞ্চাশ ন.প.॥

রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র। পরিমলচন্দ্র ঘোষ। প্রাপ্তিস্থান: এইচ. চ্যাটার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ। পাঁচ টাকা॥

মার্কসবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে অনেকেই ইতিহাস-সচেতনতার অভাবে মতবাদের শক্তিকে ঐতিহাসিক শক্তিগুলির অপেক্ষাও বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। প্রথমোক্ত পুস্তকটিতে পরোক্ষে ঐতিহাসিক শক্তিগুলিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের সচেতন পাঠকের কাছে তার রক্তাক্ত স্বাক্ষর খুব অস্পষ্ট নয়। আর ওই পুস্তকটিতে ইতিহাসকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা ইচ্ছাকৃত, তাই সচেতন পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না এ বই কাদের জন্য লেখা এবং কাদের হয়েই বা এর ওকালতি।

প্রথমোক্ত পুস্তকটির মতে যুগে যুগে রাষ্ট্রনীতিক তাত্ত্বিকগণ গণতান্ত্রিক নীতির কথা বললেও গণতন্ত্রের প্রথম ও শেষ শত্রু যে অতি-শাসনমূলক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা তার সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন না। লেখকের মতে একমাত্র গান্ধীজী-পরিকল্পিত শাসনমুক্ত সমাজই হলো এই সমস্যার সমাধান। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রসঙ্গে আর্থনীতিক বিকেন্দ্রীকরণ অতি প্রয়োজনীয়। দেশের অর্থনীতিতে ভোগ্যবস্তুর চাহিদা প্রধানত মিটবে গ্রাম্য জনসমষ্টি পরিচালিত কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের দ্বারা আর মূল শিল্পের মালিকানা থাকবে রাষ্ট্রের। এতে করে শাসনকে বিকেন্দ্রীত আর শোষণকে অবলুপ্ত করা সম্ভব বলে মনে করা হয়।

গান্ধীজীর আর্থনীতিক চিন্তাধারার স্ববিরোধিতা খুবই স্পষ্ট। ভারতের মতো দেশে যেখানে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে, যেখানে চাষযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ অফুরন্ত নয় বরং খুবই সঙ্কীর্ণ, যেখানে দু-শ বছরের ব্রিটিশ শাসনে পল্লী ও কুটিরশিল্প হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় মুমূর্ষু, সেখানে গান্ধীজীর সমাধান দারিদ্র্যের সমাধান নয় দারিদ্র্যের বণ্টন। এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে গান্ধীজীর সমাধান তথাকথিত শিল্প-বিপ্লবের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ romantic সমাধান। গান্ধীচিন্তার দুর্বলতা দেখানোর এই অর্থ নয় যে গান্ধীজীর ক্রিয়াকর্ম ভারতীয় ভূখণ্ডে কোনো স্থায়ী অবদান রেখে যায় নি। বর্তমান সমালোচকের মতে, গান্ধীজীর সামাজিক আন্দোলন ;] বিশেষ

করে, সেই সব আন্দোলন যা কিছু পরিমাণেও ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের অনুকূল, তার জন্য ভারতীয় ইতিহাসে গান্ধীজীর অবদান স্মরণীয়।

গান্ধীজী সম্পর্কে সবচেয়ে আশার কথা ছিল যে তিনি 'কর্মবাদী' ছিলেন (সেইজন্যই কি ১৯৪৮ সালে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছে ?); তাই তিনি বারে বারে জনসাধারণের মধ্যে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আজ গান্ধীশিষ্যদের অবস্থা অনেকটা যেন গিরিগোবর্ধন-ধারণে অপারগতার মতো, অথচ তত্ত্বগত উল্লাসে (এবং তাও বিকৃত ব্যাখ্যা) এঁদের প্রচুর আগ্রহ।

সত্যই যদি গান্ধীজির শোষণমুক্ত তথা শাসনমুক্ত সমাজগঠন বাস্তব সত্য হতো তবে তা ইতিহাস-শিক্ষার স্বীকৃতিতেই সম্ভব ছিল। শৈলেশবাবুর বক্তব্য হলো: গণতন্ত্র আদর্শটি একমাত্র গান্ধী পরিকল্পিত সমাজ ব্যবস্থাতেই সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে গণতন্ত্র সম্বন্ধে 'স্থায়ী' ধারণাকে কেন্দ্র করেই আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্বের তালিকা প্রণয়ন না করে লেখক ইতিহাসের শরণ নিলে দেখতে পেতেন যে 'গণতন্ত্র' বলতে কাল-নিরপেক্ষ কোনো ধারণা কোনো কালে ছিল না। গণতন্ত্রের ধারণাও যুগে যুগে পালটেছে এবং পরিবর্তিত হচ্ছে (গ্রন্থকারের গ্রন্থপঞ্জীটিতে এমন অনেক বইয়ের উল্লেখ আছে যেগুলিকে ঠিক মতো অনুধাবন করলে গ্রন্থকার তাঁর বিপরীত সিদ্ধান্ত ও লক্ষ্যেই পৌঁছতেন)। অথবা, ব্যক্তিস্বাধীনতারও যে বিকাশ হচ্ছে এবং হবে; অর্থাৎ তারও যে একটা ইতিহাস আছে এটাও ইতিহাসই আমাদের শিক্ষা দেয়। অথচ সেই ইতিহাসকে অনেকটা যেন সচেতনতার সঙ্গেই এড়িয়ে গিয়ে লেখক ব্যক্তিমানুষ ও মতবাদের ভূমিকাকে ইতিহাসের শক্তি থেকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছেন। এমন কি, ইতিহাসের যথার্থ শিক্ষা ব্যতিরেকেও লেখক খোলামন নিয়ে যদি সমস্ত সমস্যাটি আলোচনা করতেন তবে জয়প্রকাশ-প্রমুখের (নিজের নিবন্ধ রচনায় লেখক যাঁদের বইয়ের বা লেখার সাহায্য অপরিহার্য মনে করেছেন) চরিত্রের স্ববিরোধিতা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হতো না।

প্রথম পুস্তকের অনেক কথারই জবাব পাওয়া যাবে দ্বিতীয় পুস্তকটির সুলিখিত অধ্যায়গুলি থেকে। পরের পুস্তকটিতে পাঠ্য-পুস্তকের কঠিন নিয়মানুবর্তিতায় প্রথম আটটি অধ্যায়ে রাষ্ট্রের বিকাশ থেকে গণতন্ত্রের উদ্ভব-বিকাশ ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এবং জনগণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে

অবশিষ্ট তিনটি অধ্যায়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে 'গণতন্ত্রের মানদণ্ড ও দুই রাষ্ট্রব্যবস্থা,' 'ভারতবর্ষ ও গণতন্ত্র' এবং 'সমাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রশক্তি'—এই বিষয়গুলির আলোচনা প্রসঙ্গে।

পরিমলবাবু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রহসন সুন্দরভাবে পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন বলে বর্তমান সমালোচকের ধারণা; তবে একটি কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই উল্লেখ করা হলো। সমস্যার অতি-সরলীকরণ করতে গিয়ে সোভিয়েত গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রেরও যে নিজস্ব স্থানিক এবং কাল-সম্পর্কিত সমস্যা থেকে যেতে পারে লেখক তা এড়িয়ে গেছেন। বর্তমানে সোভিয়েত দেশে এইসব সমস্যাগুলি নিয়ে খোলাখুলি, এমন কি তীব্র ভাষায়ও আলোচনা হচ্ছে। এতে করে সোভিয়েত গণতন্ত্রের শক্তি ও পৌরুষেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সকলে একথা স্বীকার করবেন কিনা জানি না। আশা করব পরবর্তী সংস্করণে লেখক খোলামনে সোভিয়েত গণতন্ত্রের আলোচনা করে তথাকথিত রাজনৈতিক তৃতীয় শিবিরবাসীদের মৌমাছি-বৃত্তির অন্বেষায় মাছিতন্ত্রের প্রকোপ থেকে আমাদের রেহাই দেবেন।

এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বইটি সুলিখিত ও প্রয়োজনীয় একথা বলতে পেরে আনন্দ অনুভব করছি।

বিমল চক্রবর্তী

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভূমিকা ॥ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এম্. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিঃ। দু টাকা ॥

আলোচ্য বইটির মধ্যে যথার্থ নবীনত্ব কিছু না থাক, রবীন্দ্রশতাব্দীতে রবীন্দ্র-নাথের নাম ভাঙিয়ে সংস্কৃতি-ব্যবসায়ীরা গীতের বিতানে যে অসহ্য কলঙ্কের জ্বালামুখিতা এনে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে কিছু সত্য কথা আছে। এই সত্যের মূল্য দুইদিক থেকে পরীক্ষিত, প্রথমত লেখিকা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীতজ্ঞা, দ্বিতীয়ত তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করেছিলেন।

নিম্নলিখিত উক্তি স্মরণীয়:

"কিন্তু একথা বোধহয় সকলেই স্বীকার করেন যে শুধু স্বরলিপির সাহায্যেই সব গান যথাযথ তোলা যায় না। ভাতখণ্ডের ছয় ভাগ বই দেখেই

যদি ওস্তাদ গাইয়ে হওয়া যেত তবে সাগরেদি করবার দরকারই হত না। কোনও কোনও বিশেষ প্রতিভাবানের ক্ষেত্রে হয়তো এর কিছু ব্যতিক্রম হতে পারে, কিন্তু সাধারণ ভাবে তা সত্য নয়। মানচিত্র যেমন ভূপৃষ্ঠের হিসাব দেয়, পাঠ্যপুস্তক যেমন বৃহত্তর জ্ঞানের নির্দেশ, স্বরলিপিও তেমনি সঙ্গীতের কাঠামো। অভিজ্ঞ মৃৎশিল্পী যেমন মৃৎপাত্রের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলেন, গুণী শিল্পীও তেমনি স্বরলিপির ভিত্তিতে সঙ্গীতের রস সৃষ্টি করেন। কণ্ঠের সূক্ষ্ম পর্দাগুলি, বিশিষ্ট টান টোন মিড় গমক মূর্ছনা, সূক্ষ্মতম যন্ত্রে পর্যন্ত ধরতে পারে না—স্বরলিপি তো দূরে কথা। লিখিত ভাষা যেমন যতই জোরালো হোক, মেজাজ আনতে হলে শুধু স্বরলিপির ওপর নির্ভর করলেই চলে না, সাগরেদির প্রয়োজন।" [পৃঃ ৪৫-৪৬]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা ব্যাপারে স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথের অতিব্যক্তিত্বের কাছে খর্ব হয়ে গেছে সত্য, কিন্তু বিভিন্ন কণ্ঠস্বর ও কণ্ঠের প্রক্ষেপে বিশেষ গায়কী বৈশিষ্ট্য আনা যেতে পারে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের তিনটি অঙ্গ: "কথায় ভাব মাধুর্য, প্রকাশের ভঙ্গি এবং সুরের প্রকাশ মাধুর্য।" রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হলে গায়কীর বিশিষ্ট ঢং, বিশুদ্ধ স্বর সংস্থান, বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার উচ্চারণ, গানের অন্তর্নিহিত ভাবার্থ ও ব্যঞ্জনার প্রতি লক্ষ্য রেখে গান করা উচিত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের গাইয়ের মতো শ্রোতাকেও উপযুক্ত উপায়ে কিছুটা দীক্ষিত হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বিভিন্ন সুরের সমন্বয় সাধন করলেও মার্গ সঙ্গীতকেই ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এই কারণেই প্রথম স্তরের ধ্রুপদ-সঙ্গীত থেকে শেষ স্তরে সমন্বিত কাব্য-সঙ্গীত পর্যায়ে তাঁর গানের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। গানের মধ্য দিয়েই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সার্থক ভাবে উপলব্ধি করতে পারি, রূপের আড়ালে অরূপ বীণার ধ্বনি শুনতে পাই। মোটামুটি এই কথাগুলিই লেখিকা ও লেখক বইটির বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বিন্যাস' ও 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুর বিন্যাসটি যদি লেখিকা আরো সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্মবাণী আমাদের কর্ণে মর্মরিত করে তুলতে পারতেন তাহলে পাঠকসাধারণ বিশেষ উপকৃত হতেন। আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঐতিহ্যবাদী গাইয়েরাই এই বিশ্লেষণ নিপুণভাবে করতে পারেন। বইটির যে দোষ ত্রুটি, গ্রন্থকারদ্বয় ভূমিকাতেই তা নিবেদন করেছেন, সুতরাং এ ব্যাপারে তার উল্লেখ না করাই ভালো। রবীন্দ্র-

সঙ্গীতের ভূমিকা হিসাবে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভূমিকা' সার্থক হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

স্বরলিপির অসম্পূর্ণতা, বিভিন্ন গায়কের কণ্ঠস্বর ও কণ্ঠের প্রক্ষেপ, রবীন্দ্র-ঐতিহ্যধর্মী গাইয়েদের কালের অগ্রগতিতে বিলোপ এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়েদের বিশেষ মর্জির পক্ষপাতিত্ব অথবা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমস্ত বৈচিত্র্য গ্রহণে প্রতিভার অক্ষমতা—পরবর্তীকালে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিকাশে সহায়তা করবে। রবীন্দ্রসঙ্গীত যে প্রকৃতই রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য অবিকৃতভাবে অটুট রাখতে পারবে না, এবং বাঙলাদেশে কীর্তন, রামপ্রসাদী, বাউলের মতো স্বরের বৈচিত্র্যে গীত হয়েও বিশিষ্ট ঢং-এর জন্য বিশেষ ব্যক্তিত্বকে দ্যোতিত করবে, এর অবশ্যম্ভাবী ইঙ্গিত যেন 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভূমিকা'র মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। যে কোনো সঙ্গীতের সজীবতার লক্ষণই এই বিকাশ। শুবার্ট-এর কাব্যসঙ্গীত কি আজও একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে? এ-ব্যাপারে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই পরিবর্তনের পথে দিশারী হবে 'স্বরবিতান', শুকতারা হবে রবীন্দ্রব্যক্তিত্ব ও আদর্শ—যা তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

বার্ণিক রায়

ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীট ॥ বিদগ্ধ শর্মা। চিন্‌কো। চার টাকা পঞ্চাশ ন. প. ॥

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনার জোয়ার কিঞ্চিৎ মন্থর হয়ে এলেও জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় নি। অতি-ব্যস্ত মানুষ অবসর ও অবকাশ যাপনের জন্য লঘু পাঠে অভ্যস্ত হয়েছেন। সামান্য তথ্য সম্বল করে কল্পনার চড়া-রঙ চড়িয়ে কিঞ্চিৎ ঝাল-নুন প্রয়োগে যে-কোনো রচনাকে তরল ও সহজপাঠ্য করা চলে, রম্যরচনাকারগণ এই সুযোগ অবাধে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে বিদগ্ধ শর্মা সেই অনায়াস সুযোগ পরিহার করে মনোনিবেশসহকারে ক্লাইভ স্ট্রীট-কে প্রত্যক্ষ করেছেন। এর কারণ তিনি একদা এই তল্লাটের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী সময়ে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পালটাবার সঙ্গে সামাজিক নৈতিক পরিবর্তনের চেহারা সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন, করছেন। এই পরিবর্তনের পিছনে ক্লাইভ স্ট্রীটের দান অসামান্য। বস্তুত এই

পাড়াটি দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে বললে অত্যুক্তি করা হয় না। লেখক ছোট ছোট ঘটনার সাহায্যে ক্লাইভ স্ট্রীটের মর্ম উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হয়েছেন। শঠতা, বঞ্চনা, পরস্বাপহরণ ইত্যাদি বৃত্তিই যে ওই পাড়ায় বিশেষ সদ্‌গুণ রূপে বিবেচিত লেখক তির্যক ভঙ্গিতে তা তুলে ধরেছেন। তবে ধন-আহরণের জন্য বাঙালীদের পশ্চাদ্‌অপসরণের যে কারণ তিনি বলেছেন, তা অনেকে অগ্রাহ্য করবেন কারণ ধন-আহরণ ও হরণের ক্ষেত্রে জাতিগত বা সম্প্রদায়গত বিভেদ অতিসামান্যই বর্তমান থাকে।

লেখকের ভাষা সহজ ও সাবলীল। দু-এক স্থানে তত্ত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা না করলেই ভালো ছিল। তবু এই সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও 'ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীট' একটি উপভোগ্য রচনা।

কার্তিক লাহিড়ী

রামদুলাল সরকার [দেব]

সুকুমার মিত্র

পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে শুধু বাংলার স্বাধীনতার অবসান হলো তা নয় বাংলাদেশে যে বণিকশক্তির উদ্ভব হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা-ও অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল।

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কার ও ধনপতি জগৎ শেঠ উপাধিধারী মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠীবংশ, বিশ্বাসঘাতক নবাব মীরজাফর এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি সামন্তবর্গ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফল হয়েছিল উল্টো। সিরাজের কাঁটা দূর হলো বটে, কিন্তু ইংরেজের কাঁটা গলায় বিঁধেই রইল। তারপর মীরকাশিম ও মীরজাফরের স্বাধীন হবার চেষ্টা এবং তার ব্যর্থতার কাহিনী সবারই জানা আছে। তার পুনরুক্তি করে কোনো লাভ নেই।

জগৎ শেঠ উপাধিধারী শ্রেষ্ঠীবংশের সর্বনাশ ইংরেজই করেছিল, নবাব মীরকাশিম নয়। জগৎ শেঠ পরিবারের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের মূলে ছিল নবাব-অনুমোদিত টাকশাল। চতুর ইংরেজ ক্ষমতালাভের পরই সেই টাকশাল বন্ধ করে নিজেদের টাকশাল চালু করল। তারপরের ইতিহাস হলো বাংলার ব্যবসাবাণিজ্য ও মুদ্রার ক্ষেত্রে ইংরেজদের সর্বময় কর্তৃত্ব বিস্তারের ইতিহাস। তবু ইতিহাসে স্ববিরোধী ঘটনার সমাবেশ ঘটে। তাই, ইংরেজ বাংলার সামন্ততন্ত্রের মূলে যে আঘাত হানল এবং উদীয়মান বুর্জোয়া বা ধনিক-সভ্যতার যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করল তাতে নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও নতুন এক ধনিকশ্রেণীর অঙ্কুর মাথা তুলেছিল। এই ধনিকশ্রেণী বা মধ্যশ্রেণীর (Middle Class) পুরোগামীদের মধ্যে রামদুলাল সরকার (দেব)-এর নাম সর্বাগ্রগণ্য।

রামদুলাল জন্মগ্রহণ করেন ১৭৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে দমদমের কাছে রেকজানি গ্রামে। অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে কেমন করে তিনি বহুলক্ষপতি

হয়েছিলেন সে কাহিনী সুবিদিত। বাংলাদেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যসম্পর্ক রামদুলালের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ এক সভায় রামদুলাল সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

> "Ramdoolal may justly be said to be the pioneer of American Commerce in Bengal."

কিন্তু শুধু আমেরিকা নয় রামদুলাল ফিলিপাইন, চীন ও ব্রিটেনের বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কারবার করতেন। রামদুলাল ছিলেন বস্টন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, নিউবেরী পোর্ট প্রভৃতি মার্কিন বাণিজ্যকেন্দ্রের বড় বড় বণিকদের সোল এজেন্ট। চীনের ও ফিলিপাইনের বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কারবারও তাঁর মাধ্যমে চলত। এ সব ছাড়া তৎকালীন কলকাতার সর্ববৃহৎ বৃটিশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ফেয়ার্লি ফারগুসন এ্যাণ্ড কোম্পানীর তিনি বানিয়ান ছিলেন। রামদুলালের নিজস্ব তিনখানি বাণিজ্যপোত ছিল। কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করেন নি। রামদুলালকে বাণিজ্যনির্ভর বণিক (mercantile capitalist) বলা যায়। রামদুলালের মৃত্যু হয় ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল। রামদুলালের মৃত্যুর পর 'লণ্ডন টাইম্‌স্‌' রামদুলালের পুত্রদের (ছাতুবাবু ও লাটুবাবু) 'বাংলার রথসচাইল্ড' বলে বর্ণনা করেছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা কোম্পানীকে সাহায্য করতেন এবং কোম্পানীর নানা কাজে নিযুক্ত থাকতেন সমাজে তাঁদের মানমর্যাদা অনেক বেশি ছিল। রামদুলাল দেব বা দে সরকার বহুলক্ষপতি হয়েও এই মর্যাদা পান নি। এমন কি যেসকল ধনী ব্যবসায়ী ইংরেজদের অনুগৃহীত ছিলেন তাঁদের তুলনায় রামদুলালের মানমর্যাদা কম ছিল এমন প্রমাণ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাতি বাবু আনন্দকৃষ্ণ বোস প্রণীত 'A Short Account of the Residents of Calcutta in 1822' নামক পুস্তিকায় পাওয়া যায়।

এই পুস্তিকাটিতে কলকাতার নাগরিকদের যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে তাতে দেখা যায় প্রথম শ্রেণীতে পড়েছেন রাজা নবকৃষ্ণ চৌধুরী, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ; দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েছেন দর্পনারায়ণ ঠাকুর, রামরত্ন ঠাকুর, মুন্সী সদরুদ্দীন (সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্য বারওয়েল সাহেবের মুন্সী), দুর্গাচরণ মিত্র প্রমুখ। ব্যবসাবাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করে যাঁরা

এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বৈষ্ণবদাস শেঠ, আমীরচাঁদ বাবু, লক্ষ্মীকান্ত ধর, সুখদেব মল্লিক, নয়নচন্দ্র মল্লিক, শোভারাম বসাক (কোম্পানীর কাছে কাটা কাপড় বিক্রি করতেন), রামকৃষ্ণ মল্লিক।

রামদুলাল দে সরকার স্থান পেয়েছেন তৃতীয় শ্রেণীতে। তৃতীয় শ্রেণীতে আর যাঁরা স্থান পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন নীলমণি ঠাকুর (ইনিই দ্বারকানাথ ঠাকুরকে পোষ্যপুত্র নেন), হৃদয়রাম ব্যানার্জী (এঁর নাম বিকৃত হয়ে গলির নাম হয়েছে 'হিদারাম ব্যানার্জী লেন'), বলরাম সেন, অক্রূর দত্ত, যুগোলকিশোর আঢ্য (ব্যাঙ্কব্যবসায়ী), মথুরামোহন সেন (ব্যাঙ্কার ও ব্রফ)। মথুরামোহন সেন ও নিমাইচরণ সেন দুই ভাই। ব্যবসাবাণিজ্যও এঁরা করতেন এবং যশোরে এঁদের সাতটি নীলকুঠি ছিল।

রামদুলাল সরকার মৃত্যুকালে রেখে যান নগদ ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং বিপুল পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি। রামদুলালের ব্যবসাবাণিজ্যে কিছুটা মন্দা পড়ে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধায়। যুদ্ধ মিটলে রামদুলাল মার্কিন বণিকদের পাওনা কয়েক লক্ষ টাকা সুদসমেত ফিরিয়ে দেন। এতে খুশি হয়ে মার্কিন বণিকরা রামদুলালকে জর্জ ওয়াশিংটনের একটা তৈলচিত্র উপহার দেন এবং রামদুলালের জন্মান্ধ কন্যা বিমলার নামে তৈরি রামদুলালের 'বিমলা' বাণিজ্যপোতের (টিটাগড়ের ডকে তৈরি) তৈলচিত্র নিয়ে যান।

রামদুলালের ব্যবসাবাণিজ্য অনেকদিন চালু থাকলেও তাঁর ছেলে ছাতুবাবু (আশুতোষ দেব) ও লাটুবাবুর সময় থেকেই পূর্বসমৃদ্ধি হ্রাস পেতে থাকে। রামদুলালের দৌহিত্র শ্যামলাল (চাঁদ ?) মিত্র, অনুপ মিত্র প্রমুখ ছাতুবাবুর ব্যবসায়ের অংশীদার ছিলেন। কোম্পানীর নাম ছিল Ashutosh Deb and Nephews.

রামদুলালের বড় ছেলে ছাতুবাবু গুণগ্রাহী ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। অমিতব্যয়ী কলকাতার 'সাত বাবু'র মধ্যে ছাতুবাবু একজন। স্বাধীনভাবে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছাতুবাবুও করেন নি। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ছাতুবাবুর মৃত্যু হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পরই ভারতবর্ষের ভাগ্য ব্রিটেনের ভাগ্যের সঙ্গে গ্রথিত

হয়। ব্রিটেনের উদীয়মান শিল্পনির্ভর ধনিকশ্রেণী যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে হটিয়ে ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা হবার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করেছেন তখন বাংলাদেশে প্রথম পাশ্চাত্য বা বুর্জোয়া পদ্ধতি পরিচালিত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কের নাম হলো ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল (১৮০৬)। পরে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী ও দেশীয় ধনিকগণ (জে. জি. গর্ডন, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ) ১৬ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের সঙ্কটের ঢেউ বাংলাদেশেও লাগে এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বালে। এই ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় হাহাকার ওঠে। ছাতুবাবু ও লাটুবাবু গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হন। একটি গানে এই সঙ্কটের চেহারাটি ফুটে উঠেছে :

"মেতা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নাই।
কাকরেল নাই টালা নাই।
জলে জাহাজ নাই।
কেবল ছাতু লাটু ধুলায় পড়ে কাঁদতেছে।
... ...
পেঁচে পড়ল কলিকাতারি লোক॥
অকস্মাৎ, কি আঘাত, বজ্রাঘাত॥
ছাতুবাবু হলো কাবু, পেলে পুত্রশোক॥
একে প্রাণের শোক বড় শোক।
তায় আবার ধনের শোক।
রসের আশুতোষ নীরব হয়ে রয়েছে॥

কোম্পানীর যুগে বাঙালী ধনিকশ্রেণীর উদ্ভব পর্যায়ের অন্যতম নিবন্ধ।

বিয়োগপঞ্জী

প্রবীণ ও অগ্রগণ্য সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন-এর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে।

রমেশচন্দ্র পরিণত বয়েসে লিখতে আরম্ভ করেন। যদিও সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় কৈশোর থেকে।

রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে তাঁর এই বিচিত্র জীবনের ভূমিকা অনেকখানি। প্রথম জীবনে টোলে পড়াশুনো করেছেন। ফলে ধ্রুপদী সাহিত্যের ঐতিহ্যে তাঁর শিশু ও কিশোর মন লালিত হয়েছে। পরে প্রাইভেটে এনট্রান্স পাশ করে ঢুকেছেন কলেজে। আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের সূত্রপাত সেই থেকে। বংশগত পেশা কবিরাজীই তাঁর জীবিকা ছিল। আর, এই পেশার তাগিদে গত চল্লিশ বছর তাঁকে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে—শহরে, শহরতলীতে, গাঁয়ে। মানুষের রোগের চিকিৎসা করতে করতে অনিবার্যভাবে তাঁর শিল্প-দৃষ্টিতে সময়, সমাজ ও অস্তিত্বের বিবিধ রোগের উপসর্গ ধরা পড়েছে। চিকিৎসক হিসেবে তিনি জানেন মানুষ কি ভীষণভাবে বাঁচতে চায়, কি অপরাজেয় তার জীবনীশক্তি ও বাঁচার বাসনা। তাই চিরদিনই সাহিত্যজীবনের কর্মে তিনি তাঁর পায়ের তলায় এই অভিজ্ঞতার শক্ত মাটি পেয়েছেন।

এই প্রত্যক্ষ ও অমোঘ অভিজ্ঞতা রমেশচন্দ্রকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে ঠেলে দিয়েছে। ফলে বিগত অর্ধশতাব্দীর একজন দীন, নীরব অথচ নিষ্ঠ কর্মী হিসেবে তিনি বাংলা দেশের প্রাক্‌স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন, রাখার সজ্ঞান চেষ্টা করেছেন। একদা যেমন করেছেন কংগ্রেসের ভলান্টিয়ারী, পরবর্তীকালে তেমনি যোগ দিয়েছেন প্রগতিসাহিত্য-শান্তি আন্দোলনে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বহু 'রাজনৈতিক অপরাধী' বহুবার গ্রেপ্তার এড়িয়ে আশ্রয়ের জন্য তাঁর কাছে যাবার ভরসা রেখেছে। এই ভরসা ছিল রমেশচন্দ্রের নির্দ্বিধ প্রত্যয়ে। যার ঘোষণায় তিনি চিরদিনই অকুণ্ঠ। খানিকটা আকস্মিকভাবে হলেও, রমেশচন্দ্রের সর্বশেষ গল্প 'রুষ ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া তাই সঙ্গত হয়েছে।

আকস্মিক, কারণ হঠাৎ তাঁর দেহান্ত হয়েছে। রমেশচন্দ্র দীর্ঘদিন অসুস্থ। হার্টের ব্যারামে বহুবার তাঁকে কষ্ট পেতে দেখেছি, কিন্তু তাঁর এই অসুস্থতা

বন্ধুজনের, এমন কি তাঁর নিজের কাছেও পুরনো হতে হতে গুরুত্ব হারিয়েছিল। আর ছিল তাঁর অপরিমিত প্রাণশক্তি ও বিশ্বাস। একটা চোখ নষ্ট হয়েছিল। আর একটা চোখও ছানি পড়ে যখন তাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধ করেছে, তখনও দেখেছি তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে চোখ অপারেশন করে আবার যখন তিনি সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন, তখন রমেশচন্দ্র হাসপাতাল ত্যাগ করে বাড়িতে ফিরে সবপ্রথম তাঁর বিখ্যাত 'সাহিত্য সেবক সমিতি'র এক অধিবেশন ডেকেছিলেন। উদ্দেশ্য সকলকে আবার চোখ ভরে দেখা। নতুন করে কিছু লেখার বাসনাও ছিল। কিন্তু সে সভা বসবার আগেই রমেশচন্দ্রকে আকস্মিকভাবে আমরা হারিয়েছি।

'সাহিত্য সেবক সমিতি' তাঁর এক কীর্তি। সেই 'কল্লোল'কালীন লেখকদের সাহিত্যজীবনের শুরুতে এর প্রতিষ্ঠা এবং চিরদিনই এটি ছিল প্রবীণ-নবীন-অজ্ঞাত লেখক ও সাহিত্যরসিকের মিলনক্ষেত্র। রমেশচন্দ্রের জীবনে সাহিত্যপ্রেম ও সাহিত্যিকপ্রীতি কোন শুদ্ধ পর্যায়ে সদা জাগরূক ছিল তার সাক্ষ্য বাঙলাদেশের অধিকাংশ সাহিত্যিকই দেবেন। অথচ খুবই আশ্চর্য যে শেষপর্যন্ত অত্যন্ত অবহেলা আর অনাদরে তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে।

ঠিক 'জনপ্রিয়' না হলেও রমেশচন্দ্র ছিলেন বাঙলা কথাসাহিত্যের এক অগ্রগামী লেখক। 'শতাব্দী' ও 'কুরপালা'র মতো অসামান্য উপন্যাস তিনি লিখেছেন। আর লিখেছেন কয়েকটি প্রথমশ্রেণীর গল্প—নিঃসন্দেহে যা বাঙলাসাহিত্যের সম্পদ।

অথচ পাঠক-সমালোচক ও সম্পাদকদল তাঁর প্রতি সর্বদা সুবিচার করেন নি। আলোচনা ও সঙ্কলনে তিনি বহুসময় বিস্মৃত হয়েছেন। আজ যাঁরা রাষ্ট্রীয় খেতাব ও বিভিন্ন পুরস্কার লাঞ্ছিত বাঙলা সাহিত্যের প্রবীণ সিংহ—তাঁদের প্রায় সকলেই রমেশচন্দ্রের দীর্ঘদিনের সুহৃৎ। বছরের পর বছর চোখের সামনে তিনি এঁদের শ্রীবৃদ্ধি দেখেছেন—রমেশচন্দ্র অল্পখ্যাত, দরিদ্র, বিড়ম্বিত। বছরের পর বছর চোখের সামনে তিনি দেখেছেন কত মামুলী লেখক ও মানুষ কি সোনারকাঠির স্পর্শে দিগ্বিজয়ী হয়—রমেশচন্দ্র অল্পখ্যাত, দরিদ্র ও বিড়ম্বিতই থেকেছেন। কোনোদিন তাঁকে এতটুকু ক্ষুব্ধ, বিচলিত বা প্রলুব্ধ হতে দেখা যায় নি।

আমরা একথা বলি না রমেশচন্দ্র বাংলাসাহিত্যের যুগান্তকারী লেখক।

তিনি অল্প বই লিখেছেন—তারও কয়েকটি মাঝারি, কয়েকটি দুর্বল। নিজের প্রবল ব্যাধি (যা বহুপূর্বেই তাঁকে যে কোনো মুহূর্তে নিভিয়ে দিতে পারত), প্রবল দারিদ্র্য, জীবিকার প্রবল চাপ তাঁকে লিখতে বসার সুযোগ অল্পই দিয়েছে। তাছাড়া শেষ জীবনে অন্ধতার জন্য অনেকগুলি রচনাই তিনি নিজের কলমে লিখতে পারেন নি। তদুপরি ছিল বৃহত্তর জগতের আহ্বান। সুতরাং 'শতাব্দী' ও 'কুরপালা'র মতো উপন্যাস তিনিও যে আর লিখতে পারেন নি একথা সত্য। তবু 'শতাব্দী' প্রসঙ্গে মোহিতলালের সেই অব্যর্থ উক্তি মনে পড়ে: "আপনিই নবযুগের নবজীবনের সহজ ছন্দটি ধরিতে পারিয়াছেন—একেবারে বাংলার বাঙ্গালীর নবজীবন।...আপনার সারাজীবনের ধ্যান, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ইহার সকল উপকরণ যোগাইয়াছে...অন্যে অনেক লিখিয়া একটাতেই পূর্ণসিদ্ধি লাভ করে, আপনি একটাতেই তাহা লাভ করিয়াছেন।"

চল্লিশের দশকে বাংলা দেশে প্রগতিলেখক-আন্দোলন শীর্ষ দেশে পৌঁছেছিল! সেই পরিপ্রেক্ষিতে রমেশচন্দ্রকে বিচার করলে 'কুরপালা' উপন্যাসের অন্য তাৎপর্যও অনুদ্ঘাটিত থাকে না। কোনো ব্যক্তি নয়, একটা গ্রাম এই উপন্যাসের নায়ক। সাহিত্যে সমষ্টিজীবনের বাস্তব রূপায়ণের প্রয়াসে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তাই গল্পে উপন্যাসে রমেশচন্দ্র অজস্র ও বিচিত্র চরিত্রের স্রষ্টা।

আজ এই শোকসন্তপ্ত মুহূর্তে রমেশচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির আলোচনা সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। তাঁর বেশ কয়েকটি গল্পের বিশ্লেষণ মারফৎ প্রমাণ করা যেত রবীন্দ্রনাথ-তারাশঙ্কর-মানিক বাঁড়ুজ্জে ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যপাঠের ফল ও নিজের অভিজ্ঞতা এবং জীবনবোধ কি ভাবে কোনো কোনো গল্প রচনায় রমেশচন্দ্রকে এক স্বতন্ত্র ভাষা ও ভঙ্গির সন্ধান দিয়েছে। তা বাস্তবতা নির্ভর, কখনো পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিকতার গুণবিশিষ্ট, কখনো নগরকেন্দ্রিক, অথচ লেখকভঙ্গিতে যা এক অন্য ধরনের কবিত্ব লাভ করে সর্বজনীন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

আশ্চর্য হই রমেশচন্দ্রের অনুসন্ধিৎসা ও জাগতিক সর্বব্যাপারে প্রবল কৌতূহলে। লুমুম্বার হত্যার পর 'হায় ছায়াবৃতা' নামে বাঙ্গালী কবিদের কাব্যসংকলনের প্রকাশ-সংবাদে উৎফুল্ল রমেশচন্দ্র বর্তমান লেখককে একদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীন। তাঁরই আগ্রহে

যখন তাঁকে কয়েকটি কবিতা পাঠ করে শোনানো হলো তখন রমেশচন্দ্রের সেই অভিব্যক্তি অবিস্মরণীয়।

একই কারণে এই বৃদ্ধ বয়েসে হয়তো তিনি খারাপ লিখেছেন, কিন্তু বাস্তবতা থেকে পলায়ন করে অধ্যাত্মবাদ বা অলৌকিক রহস্যবাদের আশ্রয় নেন নি। টোলের ছাত্র এবং কবিরাজ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর লেখায় কোনোদিন আকস্মিক বা যুক্তিহীন কিছু ঘটে নি। প্রগাঢ় নৈর্বক্তিকতায় তিনি সমাজের ভাঙন ও ইতিহাসের গতিকে রূপ দিয়েছেন। প্রবল সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে যে অক্ষয় মানসসম্পদের অধিকারী করেছিল তারই ফলে ইতিহাস ও সমাজ ও মানুষই শেষদিন পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যের বিষয় থেকেছে। তাই মৃত্যুর পূর্বেও তিনি দু-চোখ ভরে এই পৃথিবী আর মানুষকেই দেখে গেছেন।

'পরিচয়' গোষ্ঠী ও বর্তমান লেখকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীর। আমরা তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখব।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েকটি প্রত্ন-সংবাদ

সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার নানা জায়গায়—বিশেষ করে উজবেকিস্তান আর কাজাকস্তানে—যে খুব ব্যাপকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের কাজ চলেছে, তার খবরাখবর মাঝে মাঝে আমরা পেয়ে থাকি। এই সব খননকার্যের ফলে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে এসব অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বহু মনোজ্ঞ তথ্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে। সোভিয়েত প্রত্নবিজ্ঞানীদের এক-একটি দল বিভিন্ন এলাকায় যে ঐকান্তিক মনোযোগের সঙ্গে এই শ্রমসাপেক্ষ কাজে নিজেদের দীর্ঘকাল ধরে নিযুক্ত রেখেছেন, তার পেছনে গভীর এক ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা ছাড়াও আছে বিশেষ করে ভারত-রুশ সম্পর্কের সুপ্রাচীন নিদর্শনগুলিকে খুঁজে বের করার মধ্যে দিয়ে আজকের ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী-সম্পর্ককে প্রাচীনত্বের দৃঢ় ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস।

এইসব প্রত্ন-আবিষ্কারগুলির মধ্যে সাম্প্রতিকতম আবিষ্কারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উজবেকিস্তানের আমু-দরিয়া নদীর তীরে কারা-তেপে গ্রামের কাছে এক দুর্গম অঞ্চলে খননের কাজ চালিয়ে সোভিয়েত প্রত্নবিজ্ঞানীরা মে মাসের শেষের দিকে সাম্প্রতিকতম যে বৌদ্ধ চৈত্যটি আবিষ্কার করেছেন, সেটাকে এ-অঞ্চলে এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত বৌদ্ধ কেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রাচীনতম বলে তাঁরা মনে করেছেন। এই খননকার্য পরিচালনা করেন প্রত্নবিজ্ঞানী বোরিস স্তাভিস্কি।

এই বৌদ্ধ চৈত্যটি আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে, তার খুব কাছেই ছিল

প্রাচীন তেরমেজ শহর—যে-শহরটিকে ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিজ খানের বাহিনী ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। ভারত থেকে মধ্য-এশিয়ার বুক চিরে ক্যাস্পিয়ান হ্রদ ও কৃষ্ণ সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত যে-বাণিজ্যপথটি ছিল ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান যোগসূত্র, সেই পথটির ওপরেই গড়ে উঠেছিল এই সমৃদ্ধ তেরমেজ শহর। এই সুপ্রাচীন বাণিজ্য-পথটির ধারে কাছে গোটা মধ্য-এশিয়া জুড়ে নানা সময়ে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রের ও মঠ-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে কারা-তেপে গ্রামের এই আবিষ্কারটি সাম্প্রতিকতম। কারা-তেপে থেকে উদ্ধৃত প্রত্নদ্রব্যগুলি আর বিভিন্ন পাত্রের গায়ে উৎকীর্ণ লিপিগুলি পরীক্ষা করে সোভিয়েত প্রত্নবিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে এই চৈত্যটি নির্মিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে। এখানে খননকার্য চালিয়ে সবচেয়ে মূল্যবান যে প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদটি সংগৃহীত হয়েছে, সেটা হলো—কয়েকটি পাত্রের ভগ্নাংশে উৎকীর্ণ ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা ষোলটি সংস্কৃত শব্দ। সোভিয়েত প্রাচ্যভাষাবিজ্ঞানী শ্রীমতী তাতিয়ানা গ্রেক এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করেছেন। প্রধানত এই লিপি থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে, প্রাচীন বক্ষু দেশে ও হিন্দুকুশের উত্তরাঞ্চলে এইটেই হলো প্রাচীনতম বৌদ্ধ চৈত্য। এখানে খননের কাজ চালিয়ে অন্য যেসব জিনিস উদ্ধার করা গেছে, তার মধ্যে আছে: নানারকম মুদ্রা, একটি লিপি-উৎকীর্ণ প্রস্তর-ফলকের কয়েকটি অংশ, শ্বেতস্ফটিকে তৈরি কতকগুলি রং-করা মূর্তির ভগ্নাংশ, একটি ছোট প্রস্তর-বুদ্ধমূর্তি এবং নানারকমের নিত্যব্যবহার্য গৃহস্থালীর জিনিস।

এই আবিষ্কারের খবরটি বিশেষ করে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রদের মধ্যে যে গভীর আগ্রহ-ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছে, ঠিক সেই রকম আগ্রহ সৃষ্টি হবার মতো আরেকটি খবর এসেছিল আরও কয়েক মাস আগে। এই প্রত্ন-সংবাদটিও উজবেকিস্তানের।

এখানকার দক্ষিণ অঞ্চলে আরেকটি গ্রাম খানাকা-তেপে-তে (উজবেক ভাষায় 'তেপে' কথাটির অর্থ জন-বসতি) কিছুকাল আগে খননের কাজ চালিয়ে কুশান যুগের স্থাপত্যানুসারী একটি প্রাসাদ আবিষ্কার করা হয়। খানাকা-তেপের এই খননকার্য পরিচালনা করেন সোভিয়েত দেশের বিশিষ্ট

প্রত্নবিজ্ঞানী গালিনা পুগাচেন্‌কোভা। শ্রীমতী পুগাচেন্‌কোভার এই আবিষ্কারের মাত্র মাস কয়েক আগে আরেকজন প্রখ্যাত সোভিয়েত প্রত্নবিদ নিকোলাই লিওনফ সোভিয়েত-আফগান সীমান্তের কাছে অনেকগুলি স্থাপত্য-নিদর্শন আবিষ্কার করেন এবং সেগুলিকে খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভকালে নির্মিত ও কুশান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে মত প্রকাশ করেন। সকলেই জানেন, উত্তর-ভারত থেকে আরাল সাগর পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে বিস্তৃত ছিল এই কুশান সাম্রাজ্য।

খানাকা-তেপের খননকার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। ইতিমধ্যে শ্রীমতী পুগাচেন্‌কোভার প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে: কুশান যুগের এই প্রাসাদের যে-অংশটুকু এ-পর্যন্ত উদ্ধৃত হয়েছে, তা স্তম্ভশ্রেণী-শোভিত ও দ্বারমণ্ডপ-সমন্বিত একটি খুব বড় আকারের সমাবর্তন-প্রকোষ্ঠ; এর একপাশে রয়েছে একটি ছোট উপাসনাস্থলী; প্রাসাদটির স্থাপত্যবিন্যাস ও নির্মাণ-পরিকল্পনা লিওনফ-আবিষ্কৃত সোভিয়েত-আফগান সীমান্তের ইমারতগুলির অনুরূপ; অলঙ্করণে ভারতীয় ও গ্রীক প্রতীকের সংমিশ্রণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়: যেমন, স্তম্ভচক্রগুলিতে আর ভিত্তি-অলঙ্করণে স্বস্তিক আর পদ্মের নক্‌শার সঙ্গে সুন্দর ভাবে মেশানো হয়েছে দ্রাক্ষাগুচ্ছ আর আইভি পাতার নক্‌শা। কতকগুলি প্রস্তর-ভাস্কর্যের ভগ্নাংশ আর পোড়া মাটির মূর্তিও এখানে পাওয়া গেছে।

পুগাচেন্‌কোভার এই রিপোর্টে ভাস্কর্যগুলির মূর্তিলক্ষণ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ না থাকলেও, ওই ভিত্তি-অলঙ্করণের বর্ণনা থেকে সেটাকে গান্ধার-শিল্পের গোড়ার দিকের নিদর্শন বলে বুঝতে অসুবিধে হয় না। কুশান-আমলেই এই গান্ধার শিল্পের অত্যন্ত ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ বিকাশ ঘটে। উত্তর-ভারত, আফগানিস্তান আর মধ্য-এশিয়ার (বক্ষু দেশ) এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে এই কুশান সাম্রাজ্যের আমলে গান্ধার-শিল্প বিকশিত হয় ভারতীয় শৈলীর সঙ্গে হেলেনিক ও রোম্যান শৈলী-সমন্বয়ের গ্রীকো-ব্যাকৃট্রিয়ান রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে।

কুশান সম্রাটদের মধ্যে কনিষ্ক যেমন আমাদের কাছে সবচেয়ে পরিচিত, তেমনি পার্থিয়ান সম্রাটদের মধ্যে গোটার্জ্‌-এর নামই ইতিহাসের ছাত্ররা সবচেয়ে বেশি জানে। ভারত-গান্ধার-বক্ষুদেশ জুড়ে কুশান সাম্রাজ্য দৃঢ়

ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় তিন-শো বছর আগে এখনকার ইরানে এই পার্থিয়ানদের অভ্যুদয় ঘটে। উত্তর-পশ্চিম চীনের কান্‌সু প্রদেশের শকদের একটি শাখা-জাতিগোষ্ঠী কুশান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলে আমরা জানি। কিন্তু পার্থিয়ানদের জাতিগত উৎপত্তির সন্ধান ইতিহাসের পাতায় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। পার্থিয়ানদের কথা ভারতের ইতিহাসের ছাত্রদের জানতে হয় এইজন্যে যে ইরানে এই পার্থিয়ানদের অভ্যুত্থানের ফলেই গ্রীক সামন্তনায়ক ডিওডোটাসের শাসনাধীন বক্‌ত্রদেশ তার পাশ্চাত্ত্য হেলেনিষ্টিক জগতের মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যার ফলে তার ওই ছিন্নমূল হেলেনিষ্টিক-রোমক সাংস্কৃতিকসত্তা আত্মরক্ষার জন্যে ভারতীয় সংস্কৃতির মাটিতে শিকড় নামায় রস আহরণের জন্যে এবং এই সমীকরণের মধ্যে দিয়েই গান্ধার-শিল্পের এমন ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিকাশ ঘটে।

খ্রীষ্টজন্মের আগে-পরে পাঁচ-ছ'শো বছরের মধ্যে এই পার্থিয়ান সাম্রাজ্য এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে তা পাশ্চাত্ত্য জগতে আধিপত্যের ক্ষেত্রে একাধিকবার রোম্যান সাম্রাজ্যকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। কিন্তু পার্থিয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক তথ্যাদি ইতিহাসবিদদের হাতে নেই বললেই চলে। পার্থিয়া সম্বন্ধে রোম্যানরা যা লিখে গেছে শুধু তার ওপরেই আমাদের এতদিন পর্যন্ত নির্ভর করে থাকতে হয়েছে। কিন্তু রোম্যানদের সেই অসম্পূর্ণ বিবরণ থেকে পার্থিয়ান সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা; তাদের সমাজব্যবস্থা, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না।

এক্ষেত্রে তাই ইরান-সোভিয়েত সীমান্তের খুব কাছে সোভিয়েত তুর্ক্‌মেনিস্তানের আশ্‌কাবাদ শহরের কয়েক মাইল দক্ষিণে অনুসন্ধান চালিয়ে পার্থিয়ানদের সম্পর্কে যেসব প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রত্নাবিষ্কারের ফলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে ওই জায়গাতেই খ্রীষ্টীয় ২য়-৩য় শতকে ছিল প্রাচীন পার্থিয়ার বিখ্যাত রাজধানী নিসা শহরটি এবং এখানে প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যগুলি থেকে এই প্রথম প্রত্যক্ষভাবে পার্থিয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যাদি পাওয়া গেল।

দীর্ঘ বারো বছর ধরে খুব ব্যাপকভাবে এই খননের কাজ চালিয়ে সোভিয়েত প্রত্নবিজ্ঞানীরা অন্যান্য বহুরকমের প্রত্নদ্রব্যের সঙ্গে ২,৭৫০টি লিপিখোদিত পোড়া-মাটির ফলক এবং অন্যান্য মৃৎপাত্রের লিপি-উৎকীর্ণ

ভগ্নাংশ উদ্ধার করেন। নিসায় এই পার্থিয়ান ভাষা ও লিপির নমুনাগুলি আবিষ্কৃত হবার আগে পর্যন্ত এই ভাষা ও লিপির একটি মাত্র নমুনাই প্রত্ন-ইতিহাসবিদদের হাতে ছিল। এটা হলো—প্রাচীন কুর্দিস্তানের যে-অংশটি বর্তমানে ইরানের অন্তর্ভুক্ত, সেইখানে ১৯১৫ সালে প্রাপ্ত একটি পার্চমেন্ট। কিন্তু ওই একটি মাত্র পার্চমেন্ট থেকে পার্থিয়ান লিপির পাঠোদ্ধার করা ভাষাবিদদের পক্ষে তখন সম্ভব হয় নি। এখন এইসব লিপিখোদিত মৃৎফলক আর মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হবার পর পার্থিয়ান লিপির পাঠোদ্ধার করা অনেক সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এই লিপি নিয়েই দীর্ঘকাল গবেষণা চালিয়ে দুজন বিশিষ্ট সোভিয়েত প্রত্নভাষাবিজ্ঞানী ইগর দিয়াকোনফ ও ভ্লাদিমির লিফ্‌শিৎস্‌ পার্থিয়ান লিপির সম্পূর্ণ অক্ষরমালা এবং সেই ভাষার পাঠ ও ব্যাকরণ রচনার কাজ সম্পূর্ণ করেছেন।

লেনিনগ্রাদের ইন্‌স্টিট্যুট ফর দি স্টাডি অফ এশিয়ান পিপ্‌ল্‌স্‌ থেকে দিয়াকোনফ ও লিফ্‌শিৎস্‌-সম্পাদিত এই পার্থিয়ান মৃৎলেখগুলির মূল পাঠ এবং তার রুশ ও ইংরেজি অনুবাদ টীকা-ব্যাখ্যা-ভূমিকা সহ এক বিরাট গ্রন্থ কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করা হচ্ছে। গত মাসে প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা গেছে। এই মৃৎলেখগুলির পাঠোদ্ধৃত হবার পর সরাসরি পার্থিয়ানদের রচনা থেকেই পার্থিয়ান সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা, তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, প্রশাসনিক কাঠামো, ক্রীতদাস-নির্ভর সমাজব্যবস্থা, করপ্রথা, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য, আইন-আদালত ইত্যাদি সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান সব তথ্য জানা যাচ্ছে। কয়েকটি মৃৎলেখে সম্রাট গোটার্জ-এর রাজ্যাভিষেক সম্পর্কে মনোজ্ঞ বিবরণ আছে এবং এই বিবরণ থেকেই জানা যাচ্ছে যে পার্থিয়ানরা ছিল ধর্মের ক্ষেত্রে জরথুষ্ট্রপন্থী।

মস্কোর ইন্‌স্টিট্যুট ফর দি স্টাডি অফ আফ্রিকান্‌ পিপ্‌ল্‌স্‌-এর অধ্যাপক খ্যাতনামা আফ্রিকাতত্ত্ববিদ ইভান পোতেখিন এই ইন্‌স্টিট্যুট-এর মুখপত্র 'আফ্রিকা-অনুশীলন'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আফ্রিকীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কতকগুলি নতুন তথ্য পেশ করেছেন যা বিশেষ ভাবে অনুধাবনযোগ্য।

পোতেখিন লিখেছেন: আফ্রিকার ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা প্রায় সকলেই সাধারণভাবে এই মতের সমর্থক যে নীলনদ উপত্যকায়

ফ্যারাওদের অধীন ভূখণ্ডে যে-সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল, সেটাই আফ্রিকার প্রাচীনতম সভ্যতা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে সাহারার মরু-অঞ্চলে কতকগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের লিপিচিত্র খোদিত শিলা আবিষ্কৃত হবার পর অনেকেই ভাবতে সুরু করেন যে ফ্যারাওদের ওই 'পিরামিড-সভ্যতা'র চেয়েও প্রাচীনতর সভ্যতার অস্তিত্ব—অন্তত সমান প্রাচীন একটি ভিন্নতর সভ্যতার অস্তিত্ব—সম্ভবত আফ্রিকায় ছিল। ওই 'সাহারা-শিলালিপি'র পূর্ণাঙ্গ পাঠ এখনও উদ্ধার করা যায় নি। অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সোভিয়েত প্রত্নভাষাবিজ্ঞানীরাও তাই নতুন ধরণের চিত্রলিপির পাঠোদ্ধারের কাজে নিযুক্ত আছেন। এই কাজ সম্পূর্ণ হলে আফ্রিকীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য জানা যাবে বলে তাঁরা মনে করেন।

এই 'সাহারা-শিলালিপি' হয়তো 'রোসেটা পাথর'-এর মতোই অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী জুড়ে এক দারুণ সাড়া জাগাবে।

রবীন্দ্র মজুমদার



দাম: এক টাকা



আষাঢ় ● ১৩৬৯